১২ জুন ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

খেলাধুলা

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার

বেশী সুস্বাদু বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।
দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—**গ্লাক্সো**

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই (FCM-3) **400 025**

আনন্দমেলা

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ ১২ জুন ১৯৮৫ । ১১ বর্ষ ৫ সংখ্যা

বড়গল্প
ফেরা । নির্মলেন্দু গৌতম ৩৮
গল্প
উপচার । আলোক সরকার ৯
জানলার ওপাশে । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১২
ধারাবাহিক উপন্যাস
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ২৫
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২
ভ্রমণকাহিনী
কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি । সুমন্ত্র বসু ৩৪
শার্লক হোমসের গল্প
বুটিদার ফেট্টি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৩
ছড়া ও কবিতা
খানাপিনা । কাজি মুরশিদুল আরেফিন ১১
চরকাবুড়ি । সুখেন্দু মজুমদার ৩০
নিট ফল । মৃণালকান্তি দাশ ৩০
দুটি ছড়া । হিমাংশু জানা ৩০
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি (ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল) । প্রসাদ ৭
অর্থ জানো (কেয়ূর···কুণ্ডল) । দেব-সেনাপতি ৭
খেলাধুলো
ইস্টবেঙ্গল ভারত-সেরা । অশোক রায় ৫৬
বেটন কাপের যুদ্ধে । সুজয় সোম ৫৮
নুয়ে পড়ল নিউজিল্যাণ্ড । রাজা গুপ্ত ৫৯
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫১, শব্দসন্ধান ৫১
মজার খেলা ৫২, হাসিখুশি ৫২

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

এখন থেকে নিয়মিত সঞ্চয় করলে ভবিষ্যতে তুমি নিজের পয়সা দিয়ে ক-ত কিছু করতে পারবে ! তখন আর বাবা-মার কাছে চাইতে হবে না। এখনই বাবা-মার সাহায্য নিয়ে সঞ্চয়ে নেমে পড়।

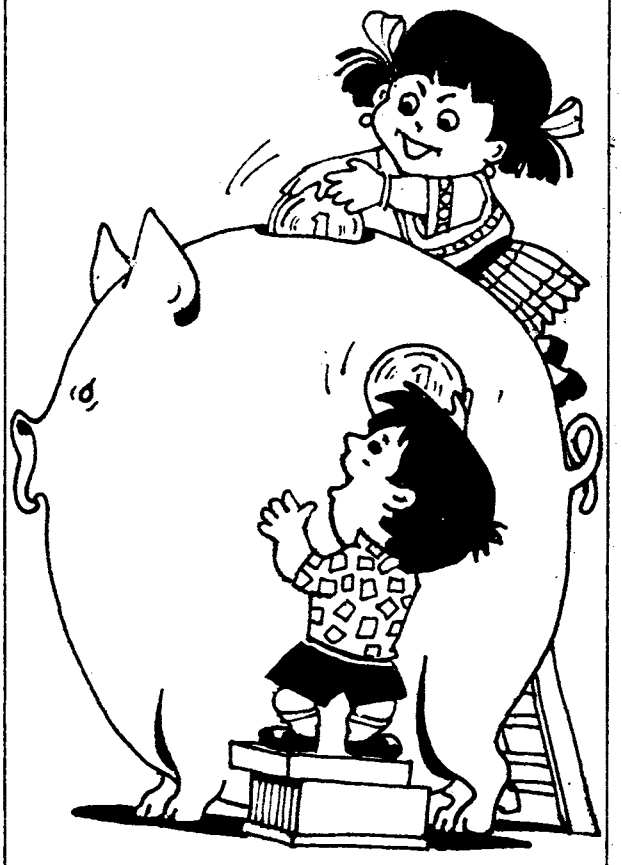

টাইমেক্স ফিনান্স অ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড
১৯৫৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে নথিভুক্ত একটি নন-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান
৫২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
রেজিষ্টার্ড নং-৩২৩০৪/স্থাপিত-১৯৭৯

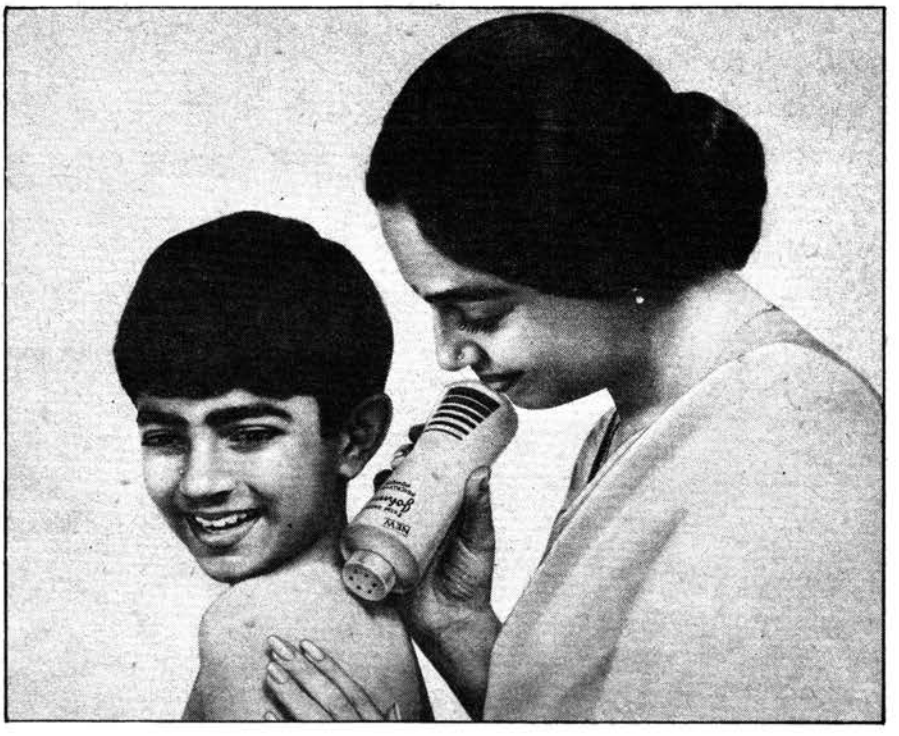

এখন পাবেন!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার

এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে।

ঘামাচিতে আক্রান্ত হবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে সক্ষম?
এখন আরো কার্য্যকরীভাবে আপনি আপনার ঘামাচি সংক্রান্ত সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার। এটি কেবলমাত্র ঘামাচিতে দ্রুত আরাম আনে তা নয়, বাস্তবিক তা রোধ করতে সাহায্য করে!

নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার আরো বেশি কার্য্যকরী কেন?
আপনি যখন ঘেমে একেবারে নেয়ে ওঠেন, এবং যখন এই ঘাম আপনার ত্বকে বেশিক্ষণ ধরে থেকে যায়, তখনই আপনি ঘামাচির সম্ভাব্য শিকার হ'তে পারেন। ঠিক এই কারণেই নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এত কার্য্যকরী।

ঘাম ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেবার উপযুক্ত করে বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ত্বকের ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ রোধ করে। তাই আর লালচে র‍্যাশ নয়, নয় কোনো জ্বলুনি বা চুলকানি। সত্যি কী দারুণ আরাম! অধিকন্তু, নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডার এখন একটি মনমাতানো নতুন সুগন্ধে সমৃদ্ধ।

আগামী গ্রীষ্মে ঘামাচিতে আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন না, তাড়াতাড়ি নতুন জনসন্স প্রিকলী হীট পাউডারের একটি প্যাক নিন। শুধু শুধু ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন কেন, আপনি যখন তা রোধ করতে পারেন?

৩ ভাবে কাজ করার জন্য বিশেষ ফরমূলাতে তৈরী:

- ঘাম আরো ভালভাবে ও দ্রুত শুষে নেয়।
- ত্বকে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ রোধ করার জন্য এতে আছে বিশেষ ঔষধি।
- আরামপ্রদ ভাবে কার্য্যকরী বলে ত্বককে ঠাণ্ডা ও তরতাজা রাখে।

Johnson & Johnson

OBM/4181 BEN

বাড়বৃদ্ধির ধরন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নিকটাত্মীয় প্রাণীরা একেবারে গোড়া থেকে একইভাবে বড় হয়, একইভাবে বদলায়। ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসার এবং পেট থেকে পড়ার আগে বাচ্চা যে অবস্থায় থাকে, তাকে বলে ভ্রূণ।

মজা এই যে, মানুষ ইঁদুর বাঁদর আর খরগোশের গোড়াকার অবস্থার ভ্রূণ দেখে বোঝাই যায় না, কোন্‌টা কার ভ্রূণ।

কেন বোঝা যায় না, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমরা। প্রাণী হিসেবে এরা যে নিকটাত্মীয়।

এর আগে 'লতায়-পাতায়'-এর শেষে মানুষের যে বংশলতা দেওয়া হয়েছে, সেটা একবার দেখে নাও। নিকটাত্মীয় প্রাণী যারা, তাদের ভ্রূণগুলোর চেহারায় খুবই মিল থাকে। কারণ, তারা এক পরিবারের।

শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের দেখতে একরকম হওয়া ছাড়াও, তাদের মধ্যে আরও নানা মিল থাকে। অনেকটা একই ছাঁদে তারা বদলায়, একই ছাঁদে বেড়ে ওঠে।

একটা মজার কথা বলি। একেবারে গোড়ায় মানুষের ভ্রূণ দেখতে হয় অনেকটা মাছের ভ্রূণের মতো। আরেকটু বড় হলে উভচর জীবের ভ্রূণের মতো দেখায়। তারও পরে দেখায় সরীসৃপের ভ্রূণের মতো। শেষকালে মানুষের সেই ভ্রূণে স্তন্যপায়ী জীবের লক্ষণ একে একে ফুটে উঠতে থাকে। এ যেন ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার ব্যাপার। মানুষের কোঠায় পৌঁছেও রেহাই নেই। ভ্রূণ অবস্থাতেই আগের ধাপগুলো একে একে টপ্‌কে আসতে হবে।

খুব ছোট্ট অবস্থায় মাছের মতন মানুষের ভ্রূণেও কানকো-থলি থাকে। মাছের গায়ের এই থলিগুলো ক্রমে হয়ে ওঠে কতকগুলো লম্বা নালি। মাছের মুখের জল সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একেবারে প্রথম অবস্থায় মানুষের ভ্রূণেও এমনি থলি দেখতে পাওয়া যায়। দু'তিন সপ্তাহ পরে সেটা মিলিয়ে যায়।

আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রে থাকে চারটে খোপ। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় গোড়ায় মাছের মতো থাকে মোটে দুটি, পরে বেড়ে সরীসৃপের মতো হয় তিনটি এবং শেষদিকে হয় পুরোপুরি চারটি খোপ।

এক সময়ে আমারও যে সত্যিকারের ল্যাজ ছিল, এ কথা আমি কাউকে বলি না। অবশ্য তখন আমি মা'র পেটে। ভ্রূণ অবস্থায় আমার যখন বয়স পাঁচ সপ্তাহ, তখন আমি লম্বায় ছিলাম এক সেন্টিমিটারেরও কম, তখন ছিল আমার শরীরের ছ' ভাগের এক ভাগের সমান ল্যাজ। তুমি হাসছ ? কিন্তু তোমারও, মশাই, ছিল। ভ্রূণ অবস্থায় সব মানুষেরই থাকে। আট সপ্তাহ পর সেটা খসে যায়। কিন্তু যেসব হাড়, পেশি আর স্নায়ুর সাহায্যে ল্যাজ নাড়ানো হয়, তার কতকগুলো হাড় পেশি স্নায়ু আমাদের সবার শরীরেই থেকে গেছে।

জন্মের ঠিক সাত মাস আগে মানুষের আপাদমস্তক কম্বলের মতো সারা গা রেশমি চুলে ঢাকা থাকে। জন্মের ঠিক আগে কিংবা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সব চুল ঝরে যায়।

তাহলে সব মিলিয়ে কী দাঁড়াল ?

প্রথমে জল-গেলা মাছ, তারপর তিন-কামরার হৃদ্‌যন্ত্রওয়ালা সরীসৃপ, তারপর সর্বাঙ্গে লোমওয়ালা স্তন্যপায়ী, তারপর ল্যাজওয়ালা প্রাণী—মা'র পেটের মধ্যে ধাপে ধাপে এইভাবেই আমরা বেড়ে উঠি।

মানুষ আর অন্যান্য শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের বড় হওয়া আর বেড়ে ওঠার এই মিল থেকেই প্রমাণ হয় : এই সমস্ত প্রাণী পরস্পরের আত্মীয় ; তাদের একই পূর্বপুরুষ না হয়ে পারে না।

(ক্রমশ)

জেনে নাও

রাস্তার ধার ঢালু কেন

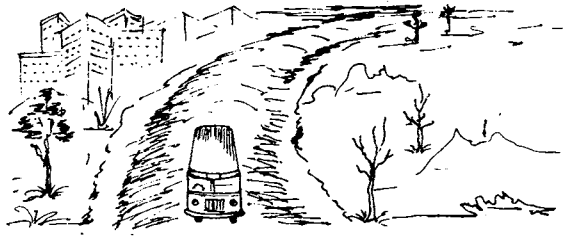

আমাদের ঘরের মেজে কী সুন্দর ! একেবারে সমান। কিন্তু যে বড় রাস্তায় আমরা হাঁটি, তা তো ঘরের মেজের মতো নয়। তার দুটো ধার ঢালু আর মাঝখানটা উঁচু, বিশেষ করে বাঁকগুলিতে। কেন ?

বড় রাস্তায় যখন কোনও গাড়ি বাঁক নেয়, তখন কী হয় ? ছুটে চলা যান যে দিকে বাঁক নেবে, ঝোঁক কিন্তু তার উলটোদিকে উলটে পড়ার। বাঁয়ে বাঁক নিলে ডাইনে, ডাইনে বাঁক নিলে বাঁয়ে। কেন ?

কারণ, গাড়ি সোজা চলতে চলতে কোনও একদিকে বাঁক নেওয়ার সময়ে তার সোজা চলার ঝোঁকটা রয়েই যায়। এই ঝোঁকটার জন্যে বাঁয়ে গাড়ি বাঁকার সময়ে তার ডাইনে টাল খাওয়ার কথা আর ডাইনের বেলায় বাঁয়ে। গাড়ি জোরে চললে এই ভয়টা আরও বাড়ে।

এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বড় রাস্তার দুটো ধার ঢালু আর মাঝখানটা উঁচু করা হয়। বাঁয়ে বাঁক নেওয়ার সময়ে গাড়ির ডানদিকে উলটে পড়ার ঝোঁক থাকবে। কিন্তু হলে কী হবে, রাস্তার ধার নিচু আর মাঝখানটা উঁচু হওয়ার জন্যে গাড়ি উলটে যায় না। ডাইনে বাঁক নেওয়ার বেলাতেও তাই।

এইজন্যে রাস্তার দুটো ধার ঢালু আর মাঝখানটা উঁচু।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

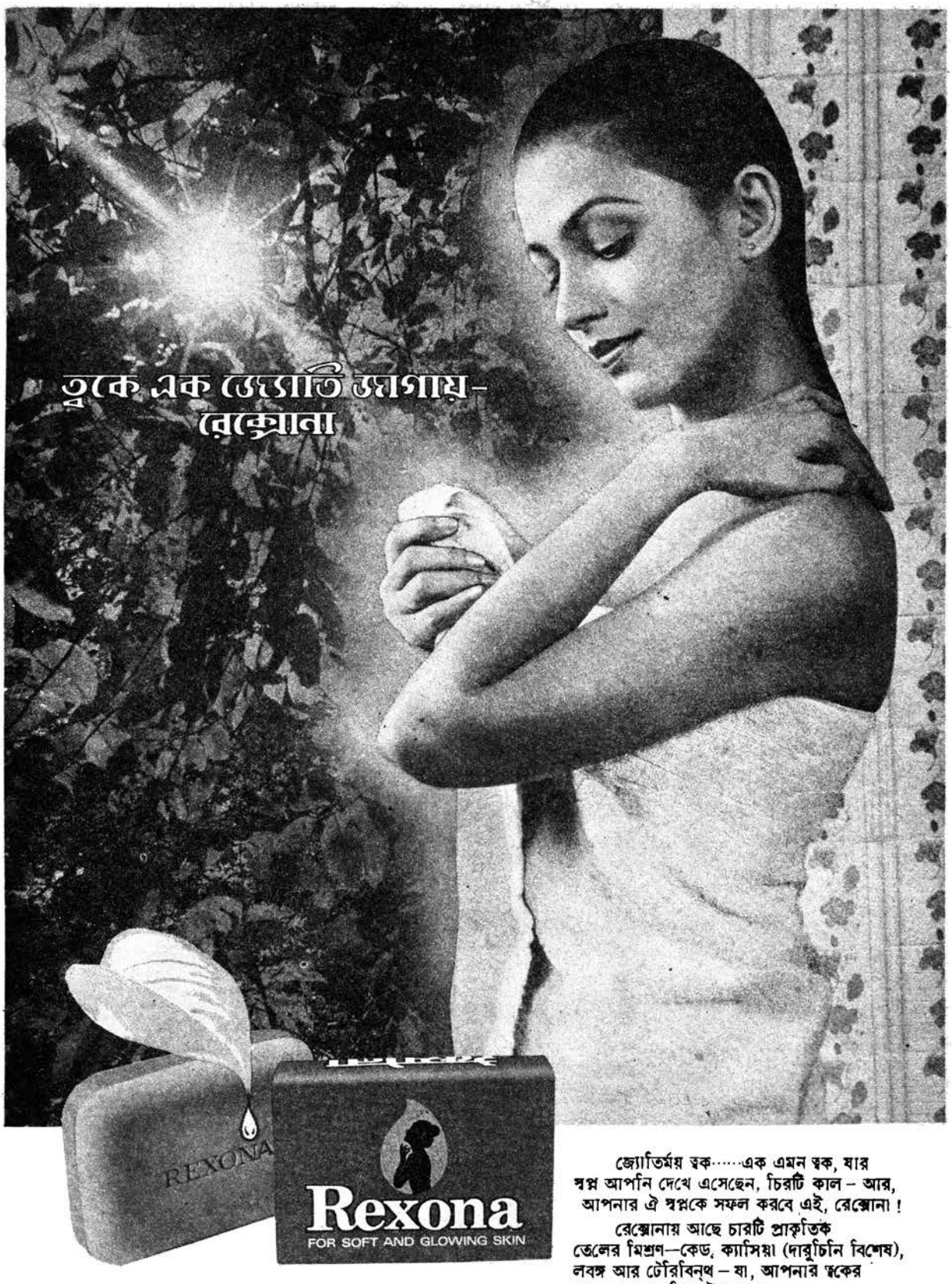

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

সহজে ইংরেজি

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল

এই বর্ষাকালের এক বাদল-ছুট সকালে চামেলির হঠাৎ মনে হল, বাড়ির ভেতরে ভাল লাগছে না, কোথাও একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়— । ছুটির দিনও বটে । বাবা, দাদা সবাই বাড়িতে ।

Breakfast was over.
Mr. Roy was doing his crossword and Mrs. Roy was listening to the radio.
Chambal was reading the newspaper.
Chameli was looking out of the window.
It had been raining almost all night.
The streets were wet.
Chameli turned to her mother.
"Mummy," she said, "let's go to the Victoria Memorial, please."
Mrs. Roy looked surprised.
"Why to the Victoria Memorial, of all places? What made you think of that?"
Chameli said a friend of hers had recently been there. She had been talking to her about it.
Chambal was not listening. He was too deeply absorbed in his newspaper.
Mr. Roy looked up from his crossword puzzle.
"Victoria Memorial?" he said. "It might not be a bad idea. There are lots of interesting things there. I've long wished to go. Why not today?"
It was then that Chambal began to pay attention.
"Why, Daddy," he asked, "are we going somewhere?"
"To the Victorira Memorial," Mr. Roy said.
Chambal looked disappointed.
"I've been to the Victoria Memorial," he said.
Mr. Roy said, "I know you've been to the Victoria Memorial, but have you been inside?"
Chambal had to admit that he had never been inside the Victoria Memorial.
Mr. Roy then said, "It's a shame so few of us care to go into that magnificent building because it houses a museum with priceless treasury. Paintings, sculptures, objects of great artistic and historical interest. Let's go today."

এবারে লক্ষ করো :

It had been raining all night.
She had been talking about it.

A friend of hers had recently been there.
I've been to the Victoria Memorial.
I know you've been to the Victoria Memorial, but have you been inside?

প্রসাদ

অর্থ জানো

কেয়ূর ... কুণ্ডল

শব্দকে যে ভাষার ভূষণ বলা হয়, তা মিথ্যা নয় । শব্দই তো ভাষায় সৌন্দর্য নিয়ে আসে । যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় অলঙ্কার । নীচে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি অলঙ্কারের নাম । এক সময়ে এই অলঙ্কারগুলির খুবই প্রচলন ছিল । প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে । যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে । সব শেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে । শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে ।

১ । **বেশর**— (ক) হাতের অলঙ্কার, (খ) নাকের গহনা, (গ) আংটি, (ঘ) নোলক ।

২ । **কেয়ূর**— (ক) চুলে পরবার গহনা, (খ) মুকুট, (গ) বাজু, (ঘ) কর্ণভূষণ ।

৩ । **কাঞ্চি**— (ক) মল, (খ) নূপুর, (গ) হার, (ঘ) চন্দ্রহার ।

৪ । **পঁইছে**— (ক) মণিবন্ধের অলঙ্কার, (খ) অনন্ত, (গ) কানের গহনা, (ঘ) মল ।

৫ । **কুণ্ডল**— (ক) হার, (খ) কানের হিরের ফুল, (গ) কর্ণবলয়, (ঘ) দুল ।

উত্তর : ১ । **বেশর**— (খ) নাকের গহনা । আকৃতি অর্ধচন্দ্রের মতো । আগের দিনে মেয়েদের অলঙ্কারে ছিল । যেমন, 'দেহে একখানিও গহনা নাই, এমনকী নাকে বেশর, কানে দুল পর্যন্ত নাই' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) ।

২ । **কেয়ূর**— (গ) বাজু । বাজু বাহুর অলঙ্কার । যেমন, 'কেয়ূর শোভিত ভুজ' (কবি জ্ঞানদাস) ।

৩ । **কাঞ্চি**— (ঘ) চন্দ্রহার । প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরা কোমরে এই অলঙ্কার পরতেন । যেমন, 'খুলিনু সত্বরে/কঙ্কণ বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা/কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি' (কবি মধুসূদন) ।

৪ । **পঁইছে**— (ক) মণিবন্ধের অলঙ্কার । মণিবন্ধ অর্থ কবজি । যেমন, 'কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল' (বঙ্কিমচন্দ্র) ।

৫ । **কুণ্ডল**— (গ) কর্ণবলয় । বলয় বা বালার মতো দেখতে । এই শব্দটি সংস্কৃত থেকে 'এসেছে, যার অর্থ কর্ণবেষ্টনী । যেমন, 'কণ্ঠী আসিয়া কণ্ঠে জড়ায়, অঙ্গে দুটি বাহুতে পরায়, কুণ্ডল দেয় কানে' (রবীন্দ্রনাথ)

দেব-সেনাপতি

আচ্ছা, কাচবার পর আপনার কাপড় জামা ঠিক ধবধবে সাদা হয় কি?

"আমি তো সেরা ডিটারজেন্ট পরিষ্কার করেই কাচি... কিন্তু ধবধবে সাদা কি হয়?"

"এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সামান্য একটু বেশি নজর দিই।

রবিনে ডুবিয়ে ধবধবে সাদা করে নিই।"

আপনার মতো আমিও বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট দিয়েই কাপড় কাচি–কিন্তু শুধু ডিটারজেন্টে ঠিক যেন ধবধবে সাদা হয় না।

তাই তো **রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে** একবার ডুবিয়ে সত্যিকারের সাদা করে কাচা শুরু করলাম।

রবিন কাপড় চোপড় ধবধবে সাদা করার উপাদান। এতে তেমন কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য নেই যা আপনার কাপড়ের রং জ্বলিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

রোজ কাপড় ধোবার পর রবিনে ডোবালে দেখবেন দিনে দিনে ধবধবে ভাবটা বেড়েই চলেছে। আর আপনার কাপড় জামা বা হাতেরও কোন ক্ষতি হবে না।

জামা কাপড় যেমন কাচেন, তেমনিই কাচুন। শুধু কাচবার পর একবার রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে ডুবিয়ে নিন। দেখবেন কি ধবধবে সাদা হয়ে গেল। আর পাঁচজনে দেখলে ভাববে, বাঃ! কাচবার পর কি যত্ন নিয়ে সাদা করা।

রবিন
ফেব্রিক হোয়াইটনার

এখন পাবেন সুবিধাজনক স্যাশেতে!

কাপড় জামা একবার ডোবালেই ধবধবে সাদা, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

CLARION C-RCR-1

উপচার

আলোক সরকার

মানুষটা কখন সামনে এসে বসেছে খেয়াল করিনি। খেয়াল করতে হল।

"খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।"

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলুম হাসিখুশি চেহারার এক ভদ্রলোক। চুল একটু উশকো-খুশকো হলেও ভদ্রলোক যে তাঁর সাজপোশাক বিষয়ে উদাসীন নন, তা বোঝা যায়। সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, সব পরিষ্কার ধবধবে, এত সাদা যে, প্রথমটা চোখ একটু ঝলসে যায় বইকী।

ক্লান্ত যে ছিলুম, তাতে আর সন্দেহ কী। এই নিয়ে তিনবার ভাত নিলুম, তবু খিদে আর মিটছেই না। ভদ্রলোকের সামনে দেখলুম কেবল এক কাপ চা। স্থানীয় লোক হবেন; সন্ধেবেলা সেজেগুজে বেড়াতে বেড়াতে চা খেতে এসেছেন।

আর আমার সারাদিন কী দুর্ভোগই গেল।

দুর্ভোগের কথাটা ভদ্রলোককে জানাতে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। আমি কেবল তাঁর কথায় সায় দেবার মতো একটু হাসলুম। কথা বলতে আমার একেবারে ভাল লাগছিল না, এমনিতেই অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখামাত্র আলাপ জমাতে আমি তেমন ওস্তাদ নই, তার উপর ক্লান্তি, আর তারও বেশি, আমার মনে হল, ভদ্রলোকের উপর কোথায় যেন একটা ঈর্ষা, রাগও বলা যেতে পারে···নিজে দিব্যি সেজেগুজে সন্ধেবেলায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, আর আমার বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি দেখানোর ভান করে মজা করা।

ভদ্রলোক বললেন, "এই হোটেলেই উঠেছেন?"

জবাবে আবার হাসলুম।

"কোন তলায়?"

এবার আর কেবল হাসি দিয়ে কাজ চালানো যাবে না। বলতেই হল, "তিনতলায়।"

"চব্বিশ নম্বর ঘর।"

ভদ্রলোক জানলেন কী করে? কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না। এবার একটু হাসিতেই কাজ সারা গেল।

সত্যি খুব ক্লান্ত ছিলুম। না হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু গল্পসল্প করাই যেত। সকাল আটটায় কলকাতা থেকে বেরিয়েছি, বারোটা নাগাদ বর্ধমানের সদরঘাটে এসে দেখলুম খেয়া বন্ধ। দামোদর একূল-ওকূল জলে ভরে গেছে। আর কী উদ্দাম স্রোত। ক'দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু কলকাতায় বসে বর্ধমানে যে এতটা বৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারিনি। বড় বড় খেয়া-নৌকোগুলো সব ঘাটে দাঁড়িয়ে, আর অসংখ্য লোক নৌকোর উপর ভিড় করে বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, "নৌকো ওপারে যাবে না?"

মাঝি বলল, "এত লোক নিয়ে নদী পার হতে গেলে বিপদ ঘটবেই। ভিড় একটু কম হলেও কথা ছিল।"

কিছু যাত্রীকে সুতরাং নৌকো ছেড়ে নেমে যেতেই হবে। কিন্তু কে নামবে? সকলেরই কাজের তাড়া, সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন। নদী পার হয়ে ওপারে আমার কলেজ, আজ জরুরি একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা। কী করে যাই!

সকলের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করতে থাকলুম। প্রায় দুটো বাজে, পরীক্ষা নেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, একজন

মাঝি এসে চুপিচুপি আমাকে জানাল, অন্য ঘাট থেকে একটা নৌকো ছাড়ছে, তেমন ভিড় নেই, আমি গেলে ও আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

মাস্টারমশাই বলে এ-অঞ্চলে একটু-আধটু অতিরিক্ত খাতির আমি পেয়েই থাকি।

মাঝির পিছন-পিছন এসে নৌকোয় উঠলুম। নৌকো ছাড়ল। সে একটা অভিজ্ঞতা বটে। বর্ষার উদ্দাম দামোদরের উপর দিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে নৌকো নিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝেই ডুবো চর—একবার ধাক্কা লাগলে ভাগ্যবশত নৌকো ভেঙেচুরে উল্টে না গেলেও চরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেও গভীর রাত। সাত-আটজন মাঝি তাদের সব শক্তিটুকু ঢেলে দিয়েছে নৌকো সামলাতে, নৌকোটাকে ওপারে নিয়ে যেতে। এ যেন একটা জেদ, একটা প্রতিজ্ঞা, প্রতিযোগিতা।

নদীর ঠিক যখন মাঝখানে, তখন মাঝিদের মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল, স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ওরা আর পারছে না। আর তার একটু পরেই নৌকোর হাল ভেঙে গেল।

এক মুহূর্ত! জলের মধ্যে বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুতগতিতে নৌকো চক্রাকারে ঘুরছে। অর্থাৎ নিশ্চিত জলমগ্ন হওয়া, নিশ্চিত মৃত্যু। ভয়ে নৌকোরই একটা দিক জোরে আঁকড়ে ধরলুম। নদীর মাঝখানে নৌকো ঘুরপাক খাচ্ছে, মাঝিদের চিৎকার, সব ঠিক কানেও আসছে না। এক মুহূর্ত, দেখলুম পারে পৌঁছে গেছি, দুটো প্রবীণ গাছের মাঝখানে আমাদের নৌকো আটকে পড়েছে।

মাঝিদের কৃতিত্ব না দৈব বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যে যাই বলুক, এ-যাত্রা বেঁচে গেছি। কিন্তু পারে এসে পৌঁছেছি বটে, তবে ওপারে নয়, যে পার থেকে যাত্রা শুরু করেছিলুম সেই পারেই ; যেখান থেকে নৌকো ছেড়েছিল তার অন্তত দু' মাইল দূরে।

ঘড়িতে দেখলুম তখন তিনটে বাজে। ঠিক করলুম কলেজ যাবার কথা আজ আর ভাবব না, কলকাতাতেই ফিরে যাব। হাঁটতে শুরু করেছি, মুখ-চেনা স্থানীয় একজন লোক বলল, "আর একটু দেখে যান, এক্ষুনি আর-একটা নৌকো ছাড়বে।"

আমি কী করব, ঠিক ভেবে পেলুম না। কোথায় যেন একটা জেদও চেপে গেল। ওপারে যেতেই হবে। তা ছাড়া আজ যদি কলকাতায় ফিরে যাই, কাল তো আবার আসতেই হবে। কলকাতায় ফিরে যাওয়া, আবার আসা, কম পরিশ্রমের নয়।

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলুম। এদিকে ঝিরঝির বৃষ্টি, তা আর থামছেই না, কাপড়-জামা ভিজে জবজবে। একটা কৃষ্ণচূড়াগাছের নীচে দাঁড়ালুম। রুমাল দিয়ে মাথা মুছলুম। ও-পারে আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত যাওয়া হল না। কোনও নৌকোই সাহস করল না বর্ষায় উন্মত্ত দামোদর পার হতে। তখন প্রায় ছ'টা। আলো অনেক কমে এসেছে। আমি সদরঘাট থেকে বর্ধমান শহরের দিকে চললুম, ঠিক করলুম এখন আর কলকাতায় ফেরার চেষ্টা করব না, বর্ধমানেরই কোনও হোটেলে থাকব। বর্ধমান শহরে আমার অনেক সহকর্মী থাকেন, কিন্তু তাঁদের আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করল না।

রিকশাওলাকে বললুম কোনও একটা হোটেলে নিয়ে যেতে, যে-কোনও হোটেল, একটা রাত কাটানো নিয়ে কথা।

রিকশাওলা কী একটা কারণ দেখিয়ে বলল, আজ হোটেল পাওয়া খুব শক্ত, শহরে ভীষণ ভিড়। তবু সে চেষ্টা করবে।

তিন-চারটে হোটেলে ব্যর্থ হবার পর এই হোটেল, তিনতলার চব্বিশ নম্বর ঘর। ঘরটা কিন্তু মোটেই খারাপ নয়, দু'দিক খোলা, ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। ঘরে ঢুকে প্রথমেই ভাল করে স্নান করলুম। তারপর ব্যাগ থেকে শুকনো কাপড়-জামা বার করে পরার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল কিছু খাওয়ার কথা, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের কাছ থেকে পাওয়া তালা দরজায় লাগিয়ে ছুটলুম একতলায় খাওয়ার জন্য। সত্যি, কী ভীষণ খিদে পেয়েছিল!

ভদ্রলোক আবার বললেন, "তিনতলায় একা একটা ঘরে থাকতে আপনার ভয় করবে না?"

ভয়ের কথা আমার মনেই আসেনি, কিন্তু এখন আমার মনে হল অপরিচিত জায়গায় একা একটা ঘরে থাকাটা বেশ ভয়ের ব্যাপার বইকী। এইসব হোটেলে কত ঘরে কত কী ঘটেছে, কেউ হয়তো আত্মহত্যা করেছে, খুন হয়েছে,কেউ হয়তো বা···কিন্তু সে-সব কিছু না বলে মুখে সাহসের ভাব দেখিয়ে বললুম, "ভয় করবে কেন?"

"মানে এইসব হোটেলের ঘরে অনেক কিছু কাণ্ড-টাণ্ড ঘটে তো। আর সব আত্মা যে মুক্তি পাবেই, এমন কোনও কথা নেই।"

"ওসব আত্মা-টাত্মায় আমি বিশ্বাস করি না।"

"কী বললেন, আত্মায় বিশ্বাস করেন না, ভূতে বিশ্বাস করেন না আপনি?"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক এমন অবাক হয়ে গেলেন যে, নিজেরই কেমন অস্বস্তি বোধ হল। বললুম, "ভূতে কেন বিশ্বাস করব? এতখানি বয়স হল, কেবল ভূতের গল্পই শুনেছি, ভূত তো আর চোখে দেখিনি কখনও।"

"ভগবানকে চোখে দেখেছেন?"

"না।"

"কত সাধনা করেও মানুষ ভগবানকে দেখতে পায় না, আর কোনও সাধনা না করেই, কোনও জপতপ যাগযজ্ঞ না করেই আপনি ভূতকে দেখতে পাবেন! ভূত কি এতই ফেলনা! ভূতের জন্যে নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করেছেন কোনও দিন? ভগবানের নামে কত ভাল ভাল উপচার উৎসর্গ করেন, ভূতের জন্যে কোনও দিন সামান্য কিছুও নিবেদন করেছেন কখনও?"

খাওয়া-দাওয়া করে তখন শরীরটা কিছুটা ভাল লাগছে। হেসে বললুম, "না, করিনি। ভগবানের জন্যও করিনি, ভূতেদের জন্যও করিনি। নিন, একটা সিগারেট খান।"

সিগারেট আমি খাই না। কিন্তু বিদেশ থেকে আনা খুব নামী-দামি এক কোম্পানির এক প্যাকেট সিগারেট আমার এক বন্ধু আমার উপহার দিয়েছিল। তার দু'তিনটে খেয়েছিলুম। সেই প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করতেই ভদ্রলোক কী খুশি।

একটা সিগারেট নিয়ে বললেন, "এই সিগারেটের কেবল নামই শুনেছি, খাইনি কখনও।"

আমি বললুম, "আপনি পুরো প্যাকেটটা রেখে দিন। আমি তো আর সিগারেট খাই না, আপনার মতো রসিক লোকের কাছে এর যথার্থ ব্যবহার হবে।"

কী যে খুশি হলেন ভদ্রলোক! এককথায় সিগারেটের প্যাকেটটা আমার হাত থেকে নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে পুরলেন।

পুরো-পেট ভাত খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম আসছিল। সারাদিন কম তো পরিশ্রম হয়নি। ভদ্রলোককে বললুম, "যাই, দামটা দিয়ে আসি।"

কাউন্টারে পয়সা-টয়সা মিটিয়ে দিয়ে খাওয়ার টেবিলে রেখে-আসা ব্যাগটা নিতে এসে দেখি, ভদ্রলোক নেই। কখন উঠে চলে গেছেন।

ব্যাগ হাতে নিয়ে আমি তিনতলায় উঠতে শুরু করলুম। আসার সময় দরজায় চাবি দিয়ে এসেছি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, চাবিটা ঠিক আছে।

সত্যি, ভদ্রলোক মনের মধ্যে একটা জট পাকিয়ে দিয়ে গেছেন। ভূতটুত সত্যি আছে কি? এই ধরনের হোটেলের ঘরে কত কী ঘটে, কত কী শোনা যায়! গা'টা কেমন ছমছম করছে।

তিনতলার ম্লান আলোর দালান পার হয়ে চব্বিশ নম্বর ঘরের সামনে এলুম। আজ সারারাত এই ঘরে আমায় একা থাকতে হবে। কেউ একজন সঙ্গী থাকলেও অন্য কথা ছিল।

চাবি বার করে দরজা খুললুম। একটি ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, দেখলুম, আলো-জ্বলা ঘরে আমার দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট কোলে নিয়ে খাটের উপর বাবু হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে বললেন, "আসুন আসুন, আপনার জন্যেই বসে আছি।"

একটু থেমে বললেন, "সিগারেটটা ভারী ভাল—দেখা পেলেন তো!"

অত দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে আমি আর কখনও নামিনি।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

খানাপিনা

কাজি মুরশিদুল আরেফিন

সন্দেশ পানতুয়া দই মিহিদানা
আপনার সব কিছু খেতে বুঝি মানা?
বেশ বেশ, খুব ভাল, এই নিন জল,
চিরতার শরবতে মেলে ভাল ফল।
ঢকঢক করে খান, হরীতকী নিন
চিরতার শরবতে দুটো ফেলে দিন।
ভারী মজা, আর চাই? কুইনিন আছে,
রোজ খেলে ম্যালেরিয়া ঘেঁষবে না কাছে।
কালমেঘ রস খান, বেড়ে যাবে দম
তারপর যত খুশি খান চমচম।
আহা এত চুপ কেন, চটপট খান
এর পরে আছে শেষে বাদশাহি পান।
চেটেপুটে খেয়ে নিন সব তাড়াতাড়ি
'না না থাক, কাল খাব, আজ যাই বাড়ি।'

ছবি : দেবাশিস দেব

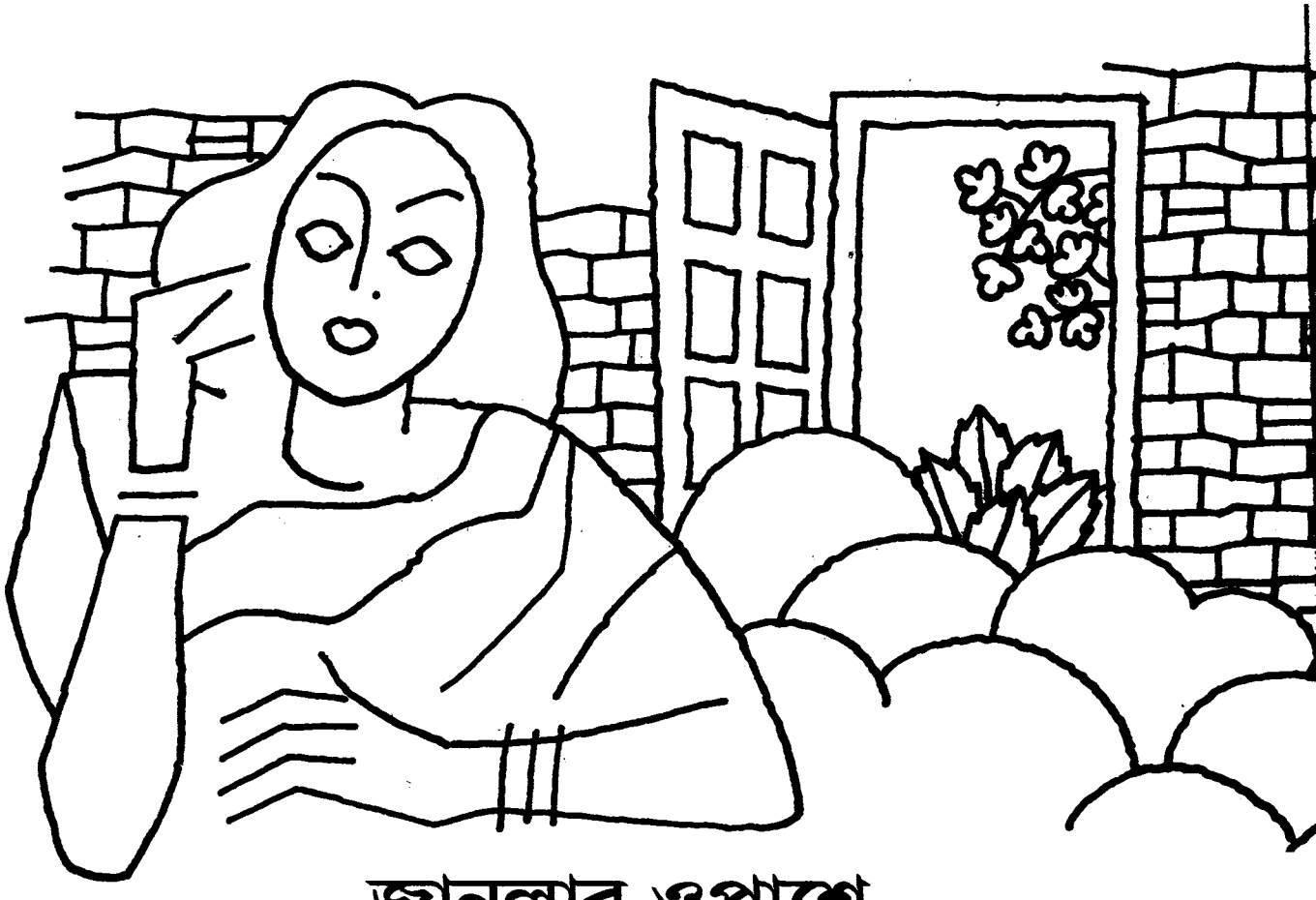

জানলার ওপাশে

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

বাপন জানে রাত্তিরে এই সময়টা বাবা একলা থাকতে ভালবাসেন। একটা সময় ছিল যখন আকাশের দিকে তাকালে বাড়তি কিছু দেখতেন। যা মনে হত লিখে রাখতেন ডায়েরির পাতায়। পরের জীবনটা এই সময়ের সঙ্গে জোড়ে মিলল না। ডায়েরিগুলো হারিয়ে গেছে কবে।

এখন বাবা অফিসে বসেন এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড ঘরে। আগেকার আমিকে মনে পড়ে না। আকাশের দিকে তাকাবার ফুরসত কই। ফাঁক পেলে রাত্তিরে খাবার আগে দশ তলার এই ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন বাবা। তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। পুরনো সেই লেখালেখির কাজই করেন বোধহয়। তবে কাগজে-কলমে নয়, মনে মনে।

এই সময়টা কথাবার্তার বাইরে রাখতে চান। টেলিফোন ধরেন না। বাবা এমনিতেই একটু দূরের মানুষ। কতটুকু সময়ই বা বাপন কাছে পায়। আবার মাকেও কথাটা জিজ্ঞেস করার নামেই অস্বস্তি। মা আগে কলেজে অঙ্ক কষাতেন। বাপনের জন্মদিনে বিজ্ঞানের বই উপহার দেন। মাকে বললে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। উলটো বিপত্তিও হতে পারে। হয়তো শোনাতে বসবেন পনেরো বছর বয়েসে কোন্ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কী প্রতিভার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার গল্প। অথচ বন্ধু টুকাইয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক হয়ে গেছে বিকেলে : ভূত আছে, না নেই ? বাপন মায়ের কথাগুলো নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিল—ভূতটুত কিছু নেই। আসলে বহু বছরের সংস্কার, অজ্ঞতা আর ভয়ের সঙ্গে পরিবেশের কিছু অস্বাভাবিকতা মিলে হ্যালিউসিনেশানের সৃষ্টি করে। টুকাই কিন্তু মেনে নিল না বাপনের যুক্তি। ওর ছোটমামা নাকি নিজের চোখে এক মৃত বন্ধুকে দেখেছেন শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর। ছোটমামাও আগে কিছু মানতেন না। এই অভিজ্ঞতার পর থেকে স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে মেলাই পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছেন।

নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করল বাপন। তারপর নিয়ম ভেঙে বাবার এই সময়ের নিজস্ব সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ার কথা ভাবল। দশতলার ওপর থেকে কলকাতাকে চির-দেওয়ালির শহর বলে মনে হয়। ওপরে তারার শলমা-চুমকি বসানো মস্ত চাঁদোয়া। এখান থেকে দেখলে আকাশের চেহারা অন্যরকম।

বাবার সঙ্গে সব সময় থাকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার। নিজে খান খুব কম, অন্যকে বিলোন বেশি। তবে এই সময়টাতে জ্বলন্ত সিগারেট বাবার আঙুলে ধরা থাকে। আজও ছিল।

"বাবা," বাপন একটু দোনোমোনো করে নিচু গলায় ডাকল।

"কী রে, কিছু বলবি ?" বাবা যে তারাদের রাজ্যপাট ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন বুঝতে পারেনি বাপন। তাই কথাগুলো সাজিয়ে নিতে একটু সময় লাগল। বাবা কিন্তু তাকিয়ে আছেন বাপনের দিকে। আবছা আলোতেও বাবার মুখে একটা আলগা হাসি। এ-রকম হাসি ভেতরের কথা টেনে আনে।

বাপন চোখ-কান বুজে দুদ্দাড়িয়ে বলে ফেলল। বাবা কিন্তু হাসিটাকে টেনে বাড়ালেন না। তেমনই তাকিয়ে রইলেন বাপনের দিকে। "পরশুরামের লেখা মহেশের মহাযাত্রা পড়েছিস ?" বাবার প্রশ্নটা বাপনের কাছে মনে হল একটা ধাঁধা। বলতেই হল, এরকম কোনও লেখা সে পড়েনি।

"এই জন্যেই আমি সোকল্ড ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলগুলো দুচক্ষে দেখতে পারি না," বললেন ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশানের প্রাক্তন ছাত্র, "রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া, অবন ঠাকুরের বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি, সুকুমার রায়ের বানানো একটা আশ্চর্য নেভার-নেভার ল্যাণ্ড—এ সবই চিরদিন নাগালের বাইরে থাকবে। পরশুরাম তো অনেক দূরের কথা।"

বাপন কিন্তু বাবাকে নতুন করে চিনছে। মস্ত বড় মাল্টিন্যাশানালের ব্যস্ত সিনিয়ার একজিকিউটিভ নন। বেশ আটপৌরে ঘরোয়া গোছের বাবা। যিনি বাড়িতে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে মেঝের ওপর বসে ছেলের হালচালের খোঁজখবর নেন। "পরশুরামের গল্পে মহেশ আর হরিনাথ দুই বন্ধুর মধ্যে এই একই প্রশ্ন নিয়ে হাতাহাতির অবস্থা," বাবা বলে চললেন, "তবে আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা একটা বর্ডার লাইন কেস হয়ে আছে। মানে, ইট ক্যান বি এক্সপ্লেণ্ড আইদার ওয়ে। মহেশ মৃত্যুর পরে হরিনাথকে বলে গিয়েছিলেন, আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি, বিশ্বাসীরা হয়তো তাই বলবে। আবার যদি বল হ্যালিউসিনেশান, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা, তাহলেও প্রতিবাদ করব না। সেভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়।"

"তার মানে, তুমি বলতে চাও তোমার নিজেরই সুপার ন্যাচারাল এক্সপিরিয়ান্স আছে।" বাপন তার রাশভারী বাবার কথা শুনে তাজ্জব।

"ইয়েস স্যার, যদি শুনতে চাও তো ঘর থেকে একটা ফোল্ডিং চেয়ার এখানে নিয়ে এসো।"

বাপনকে আর বলতে হল না। ডিনারের মেনুতে আজ রেশমি কাবাব আছে। মা জনার্দনদাকে নিয়ে কিচেনে ব্যস্ত। বাবা এর মধ্যে আবার নতুন করে সিগারেট ধরিয়েছেন।

বাবা মানে চোখা ইংরিজি উচ্চারণ, স্যুট-টাই-পরা একটি জলজ্যান্ত ব্যস্ততা। গল্প যারা বলে তাদের চালচলনের সঙ্গে মেলে না। অথচ একই মানুষের মধ্যে থাকে এমন একজন যে কখনও চেনা, কখনও অচেনা। সেই অচেনা মানুষটাই গল্পের বঁড়শি দিয়ে টেনে নিল বাপনকে।

"যত দিন যাচ্ছে," বাবা বললেন, "মানুষ ততই সরে যাচ্ছে প্রকৃতির কাছ থেকে। আমাদের ছোটবেলাতেও কলকাতায় কত বেশি গাছ ছিল। বছর দশ-বারো আগেও বাকসা ডুয়ার্সের জঙ্গলে দেখেছি দিনদুপুরে সন্ধেবেলার আলো-আঁধারি। আমার ঠাকুর্দা একটা ছোট ব্যবসা থেকে তিন-চারটে বড় ব্যবসা বানাতে পেরেছিলেন। আদতে কিন্তু গ্রামের লোক। গাছপালা ভালবাসতেন। মাঝেসাঝে তাঁর ইচ্ছে হত

আহ্, কি দারুণ অনুভূতি!

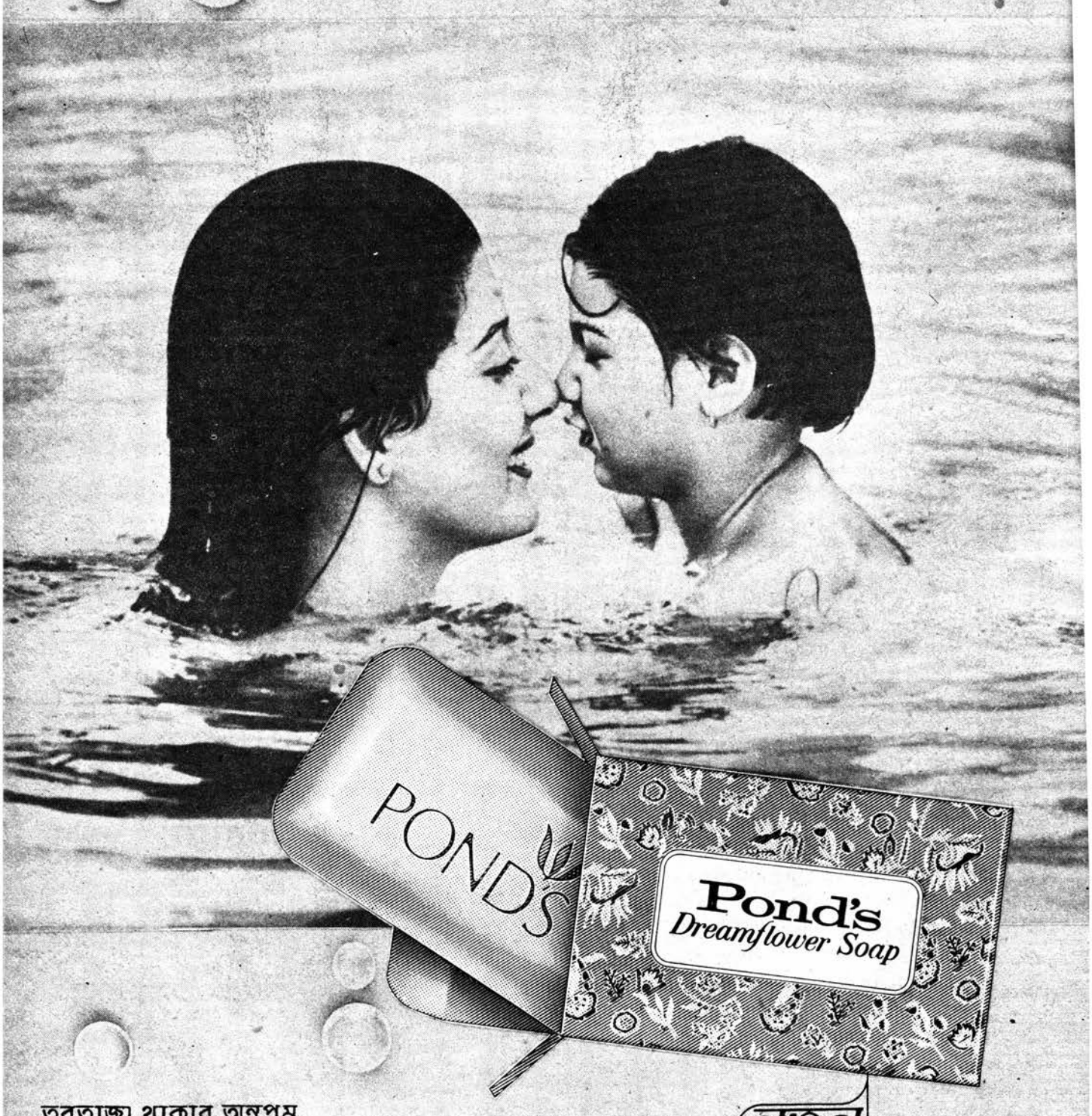

তরতাজা থাকার অনুপম
সুখানুভূতির মুহূর্তগুলি
আবেশঘন হয় নতুন পণ্ডস্
ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান মেখে
স্নানের পরে...এ যে তাজা
ফুলের সুগন্ধে ভরপূর। আহ্ কি
দারুণ অনুভূতি!

নতুন

পণ্ডস্

ড্রীমফ্লাওয়ার সাবান

OBM 8682 BEN

ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসেবনিকেশ দিন-কয়েকের জন্যে ভুলে যেতে। দু-চোখ ভরে আকাশের নীল আর গাছের সবুজ দেখে আবার নতুন উৎসাহে কাজে লেগে পড়া। তাই কলকাতার নাগাল ছাড়িয়ে পেল্লায় এক বাড়ি করেছিলেন মধুপুরে। সেকালে অনেক সচ্ছল অবস্থার বাঙালিই বাড়ি করতেন এই রকম ফাঁকফর্দা জায়গায়। কতকটা হলিডে রিসর্ট গোছের। একটু গাছপালা, নির্জনতা, পাখির ডাক, মনটাকে তরতাজা করে দিত। এখনও সেসব বাড়ি পড়ে আছে নানান জায়গায়। কিন্তু তাদের হালের মালিকরা ওদিক মাড়ানো মানে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করে।"

"তুমি যে বাড়িটার কথা বললে সেটা এখনও আছে?" বাবা একটু থামতেই বাপন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ আছে, আমি শেষবার গেছি বছর-কুড়ি আগে।" বলতে বলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা, বললেন, "কিন্তু আর যাইনি, যাবও না বোধহয় কোনওদিন।"

"কেন বাবা?" বাবার তৈরি সাসপেন্সের চতুর্দোলা থেকে নামবার জন্যে বাপন জিজ্ঞেস করল।

"সেইটেই আমার গল্প," বাবা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, "আর তার মধ্যেই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর।"

"তুমি যেমন আমার এক ছেলে," বাবা নতুন করে খেই ধরলেন, "আমিও আমার বাবার এক ছেলে এটুকু তুমি জানো। আমার ঠাকুর্দা ডালপালা ছড়িয়েছিলেন অনেকগুলো। সবসুদ্ধু বোধহয় জনা-চোদ্দ ছিল। আমার বাবা তো শেষের দিকের ছেলে। আমার জ্ঞান হয়ে আমি তিন জ্যাঠা আর দুই পিসিকে দেখেছি। তাও এক জ্যাঠা, তিনি আবার বিয়ে-থা করেননি, সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় পুজো কি গরমের ছুটিতে দাদু, ঠাকুমা, জ্যাঠতুতো আর পিসতুতো ভাইবোনেরা গিয়ে জমায়েত হত মধুপুরের সেই বাড়িটাতে। সবাই যে সব সময় যেত তা নয়। তাহলেও বাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠত। ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছি, তাই জ্যাঠাইমা আর পিসিমাদের একটু বাড়তি আদর পেতাম। আরেকজনের স্নেহ-ভালবাসার সিংহভাগ তোলা ছিল আমার জন্যে। সে হল মেজো জ্যাঠার ছোট মেয়ে শিপ্রাদি। আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। তাকে শেষ দেখি আমার দশ বছর বয়সে। সেও আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। তাকে দেখি মানে তার জলে ভেজা দেহটা দেখি। ওই মধুপুরের বাড়িতেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কী করে বলতে পারব না। আমি ছোট, তাই হয়তো ব্যাপারটা কেউ কেউ আমার সামনে আলোচনা করেনি। তবে সেই বয়েসেই জানতাম শিপ্রাদির মধ্যে একটা অ্যাবনরমালিটি আছে। ছোটবেলায় একবার মেনিনজাইটিস হয়েছিল। সেকালে এসব রোগের চিকিৎসা প্রায় ছিল না কিছু। তবু কী করে যেন বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছিলেন ওর দ্বারা লেখাপড়া আর হবে না। কোনও রকম বাড়তি মানসিক চাপ ওর জখম মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। তাই পড়াশোনার জন্যে কেউ জোরাজোরি করেনি ওকে। মেজো জ্যাঠাইমা শিপ্রাদিকে নিয়ে অনেক সময় থাকতেন মধুপুরের বাড়িতে। প্রকাণ্ড আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল আর ফুলের বাগান। তার মধ্যেই শিপ্রাদি কতকটা কপালকুণ্ডলার মতো বড় হয়ে উঠেছিল।

"কেন জানি না আমাকে অসম্ভব ভালবাসত। প্রায়ই

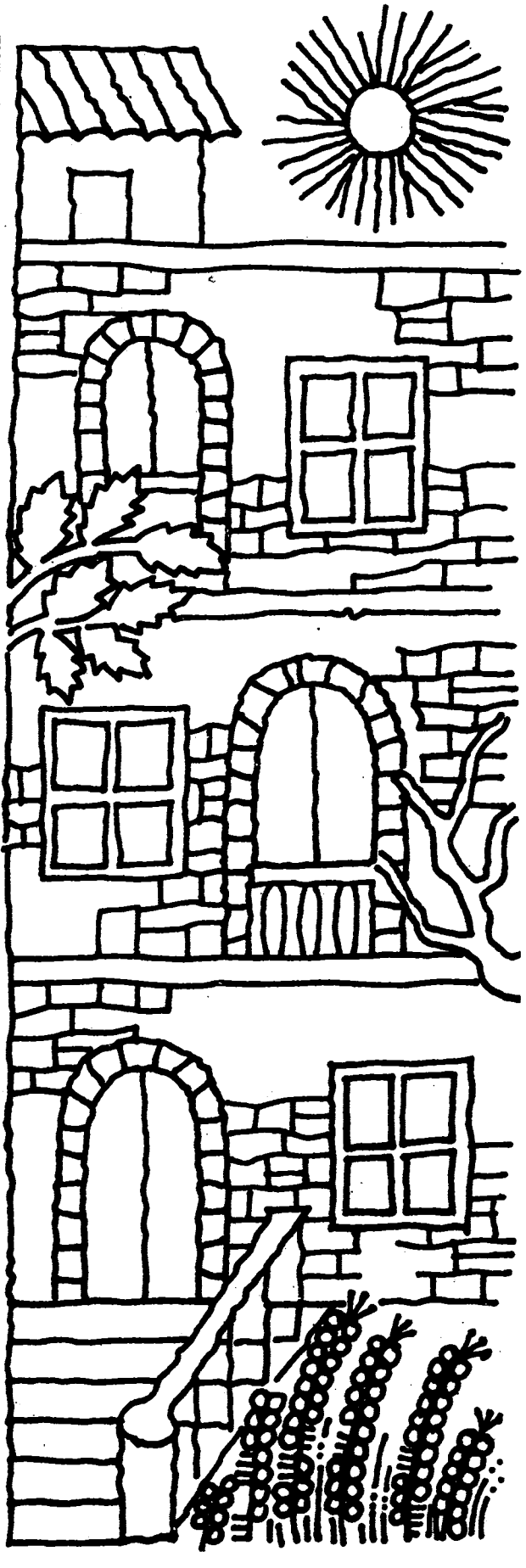

আমাকে বলত, অভি, আমি যখন থাকব না, তখন মনে রাখবি তো আমাকে ? আমি বলতাম, কেন, তুমি আবার কোথায় যাবে। শিপ্রাদি বলত, দেখিস একদিন আমি হারিয়ে যাব, আর দেখতে পাবি না আমাকে। তুই কিন্তু আমার কথা ভুলিস না। কথাগুলো বলতে বলতে শিপ্রাদির চোখ জলে ভরে উঠত। তাই দেখে আমারও কান্না পেত। ও চোখের জল মুছে বলত, ভুলে যদি যাস, তাহলে আমিই তোকে মনে করিয়ে দেব। তখন ওর কথাগুলোর মানে বুঝিনি।

"সুন্দর মাটির পুতুল বানাত শিপ্রাদি। নিজেই সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে রঙ করত। সে পুতুলের দাবিদার ছিল অনেক। কিন্তু সেরা পুতুলগুলো আমার কপালেই জুটত। এই নিয়ে আবার ভাইবোনদের মধ্যে নানান মান-অভিমানের পালা চলত। যা হোক একটা সালিশি করে দিত ওই শিপ্রাদিই। সবাইকে কাছে টানত, গল্প বলত বানিয়ে বানিয়ে। গল্পগুলো ঠিক মনে নেই এতদিন পরে। তবে এটুকু খেয়াল আছে সেগুলোর চরিত্র বা পরিবেশ কোনওটাই ঠিক চেনাজানার মধ্যে পড়ে না। আবার এক এক সময় কী রকম যেন একা হয়ে যেত সকলের মধ্যে থেকেও। কথা বললেও জবাব দিত না তখন। কাউকে দেখেও দেখত না। মুখে ফুটে উঠত এক অদ্ভুত হাসি। সে হাসির সঙ্গে কোনও কিছুর মিল দেওয়া যায় না। তখন কেন জানি আমার মনে হত শিপ্রাদি ঠিক আমাদের মতো মানুষ নয়। আমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকার জন্যে আসেনি। কোনও প্রিয়জন যেন বেড়াতে এসে থেকে গেছে কিছুদিনের জন্যে। আবার যেদিন ঘরের কথা মনে পড়বে, সেদিনই চলে যাবে। মাঝে-মাঝে ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে বেপাত্তা হয়ে যেত। হাজার খুঁজেও ওর নাগাল পাওয়া যেত না। আবার নিজে নিজেই চলে আসত। কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করলে হাসত শুধু, জবাব দিত না।

"শিপ্রাদির জীবনের শেষ দিনটার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। পুজোর ছুটির সময়। আমরা সবাই মিলে গাইতাম, আজি ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা। শিপ্রাদি ওর ঝামর চুল উড়িয়ে নিজের মতো করে নাচত আমাদের গানের সঙ্গে। গায়ের রঙ ফর্সা হতে গিয়েও হয়নি। কিন্তু চোখমুখ ছিল দেবীপ্রতিমার মতো, আর ছিল মস্ত এক ঢাল চুল যা কখনও খোঁপা বা বিনুনির চেহারা নেয়নি। ওর মতো চুলের গোছ আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

"দুপুরে খাওয়ার আগে শিপ্রাদিকে পাওয়া গেল না সেদিন। খোঁজাখুঁজি ঠিকই হল। তবে বড়রা কেউ ভীষণরকম তোলপাড় কিছু করল না। এ-রকম ডুব মারাটা নতুন কিছু নয়। শুধু আমার মনটা কেন জানি ছ্যাঁত্ করে উঠল। সেদিনই সকালে আমাকে বলেছিল, জানিস অভি, ওরা সব সময় আমাকে ডাকছে। খালি বলছে, চলে আয়, চলে আয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারা তোমাকে ডাকে এমন করে। আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। নিজের মনে বলল, ওরা তো মাঝে-মাঝেই আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। নিজেই আবার জোর করে ছাড়িয়ে চলে আসি। কিন্তু এবারে বোধহয় আমার যাবার সময় হল। গেলে আর আসব না। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কী রে, আর যদি না আসি, মনে রাখবি তো আমাকে। আমার বুক ঠেলে কান্না আসছিল। জোর করে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলাম। জীবিত অবস্থায় সেই ওকে শেষ দেখি।"

বাবা আবার নতুন করে সিগারেট ধরালেন। পর-পর তিনটে সিগারেট কখনও খান না। বাপন অবাক হতে ভুলে গিয়েছিল। এক মনে শুনছিল বাবার কথাগুলো।

"বিকেলের দিকে একটা হৈ-চৈ শুনলাম। তার সঙ্গে সেজো জ্যাঠাইমার আছাড়িপিছাড়ি কান্না। আমি যখন গেলাম, কুয়ো থেকে তোলা হয়েছে শিপ্রাদিকে। ভিজে কাপড়ে, এক ঢাল ভিজে চুলের ফ্রেমে বাঁধানো মুখে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও ছাপ নেই। চোখ বোজা। মুখে সেই হাসিটার আভাস। যে হাসির মানে বোঝা যেত না। ও নিজেও কখনও বোঝাত না। আমি ভাবতেই পারছিলাম না শিপ্রাদি আর বেঁচে নেই। কে যেন আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল কুয়োতলা থেকে।

"শিপ্রাদির মারা যাবার পরেই ও বাড়ির আনন্দের হাট ভেঙে গেল। এক বছর আগুপিছু করে আমাদের দাদু আর ঠাকুমা বলে ডাকার কেউ থাকল না। বাড়িটার সঙ্গে দূরত্ব বেড়েই চলল। বাবা-জ্যাঠা-পিসিদেরও ওদিক পানে যাবার ইচ্ছেয় ভাঁটার টান। অথচ সকলেই জানে বাড়িটা ঠিকই আছে; আছে ওখানকার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে নায়েবগোছের একজন। তাছাড়াও আছে কাজের লোক, দরোয়ান। এমনি করে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। আমি লেখাপড়া শেষ করে একটা কোম্পানিতে সেলসের কাজে ঢুকলাম। পাটনায় আমাদের মতো ফেরিওয়ালাদের জন্যে একটা অফিস থেকে কনফারেন্স ডেকেছিল। সেখান থেকে ট্রেনে ফিরছিলাম কলকাতায়। শীত পড়ি-পড়ি করছে তখন। দুপুর নাগাদ ট্রেন পৌঁছল মধুপুর। আগেও বহুবার এপথে এসেছি, গেছি। স্টেশনটা বোধহয় ঘুমের মধ্যে পার হয়ে গেছি অনেক রাতে। কিন্তু দিনের আলোয় জায়গার নামটা থিতিয়ে পড়া অনেক স্মৃতিকে তোলপাড় করে তুলল। সেই সব স্মৃতির হাত ধরে মনটা চলে যেতে চাইল ছোটবেলায়। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে হাল আমলে ফেরাতে পারলাম না। বাড়িটা চুম্বক হয়ে টানতে লাগল আমাকে। সুখে-দুঃখে একাকার বাড়িটার স্মৃতি আমাকে বের করে আনল ট্রেনের কামরা থেকে। সেই প্রচণ্ড টানকে ততক্ষণে আরও জোরদার করেছে আমার নিজের হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা কৌতূহল। দেখিই না কেমন আছে বাড়িটা। আবার কাল সকালেই তো কলকাতা ফেরার পালা। একটা রাত না হয় নাড়াচাড়া করব ছোটবেলার স্মৃতিগুলো নিয়ে।

"নায়েববাবু আরও বুড়িয়ে গেছেন। তবু আমাকে চিনলেন ঠিকই। খুব খুশি আমাকে দেখে। আগের দিনের কথা মনে করে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেউ আর এদিক মাড়ায় না বলে দুঃখের শেষ নেই তাঁর। এই বিশাল বাড়ি যক্ষের মতো আগলে বসে আছেন। উনি চোখ বুজলে এই মস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে।

"বাড়িটার তিনতলায় ঘর ছিল কুল্যে একখানা। কেন জানি না ওই ঘরটাতেই রাত কাটানোর ইচ্ছে হল আমার। নায়েববাবু একটু খুঁত-খুঁত করলেন। নীচের ঘরগুলো সাফসুতরো করাই আছে। খাট-বিছানারও অভাব নেই। আমি তবু তিনতলার ঘরটাতে থাকবার জন্যে জেদ করলাম। সারা বিকেল, সন্ধে এলোমেলো ঘুরে ছোটবেলার সঙ্গী-সাথীদের খুঁজলাম। বিশেষ

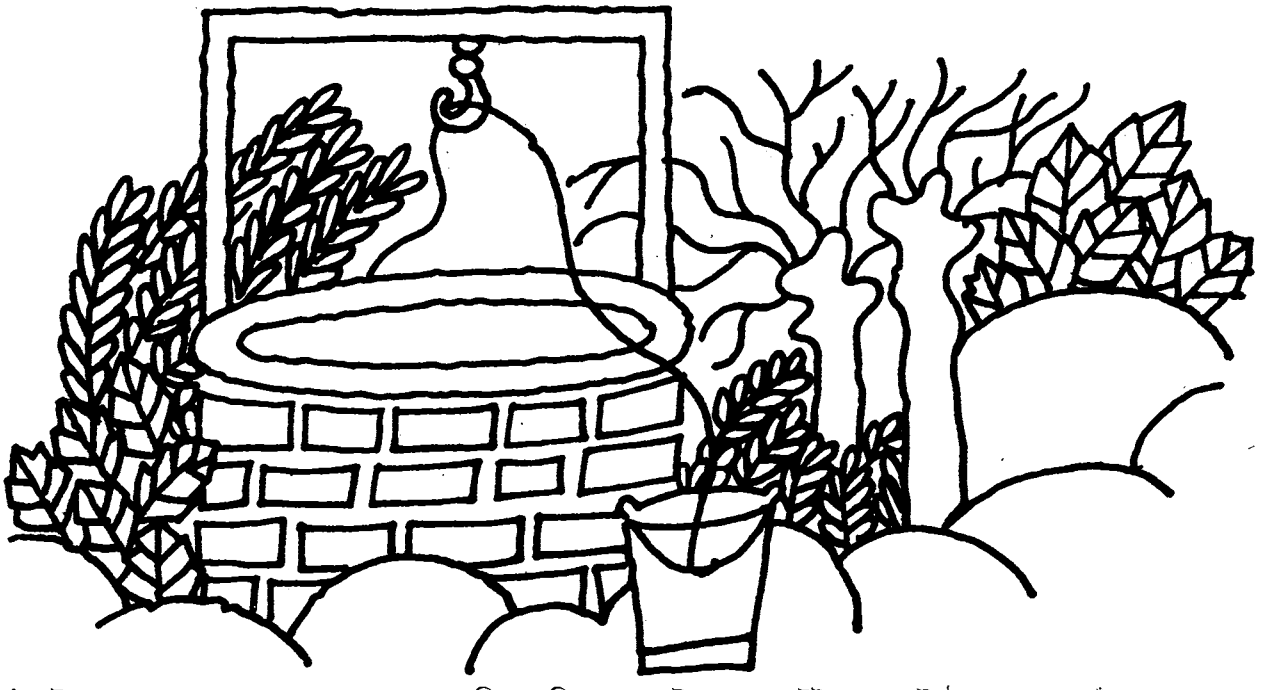

কাউকে পেলাম না। যে ক'জন আছে, তারাও নিজের নিজের রুটিরুজির ধান্ধায় ব্যস্ত। ছোটবেলার স্মৃতিচারণের ইচ্ছে বা সময় কোনওটাই নেই তাদের।

"খবর দিয়ে আসিনি। তাহলেও দুবেলা খাওয়াদাওয়া ভালই হল। রাত্তিরের খাবার পাট চুকিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। পরের দিন ভোরঘেঁষা সকালে ফেরার ট্রেন। তিনতলার ঘরটায় ঢুকে আলো জ্বালতেই চার দেওয়াল চারটে হাত হয়ে আপনজনের মতো টেনে নিল আমাকে। বইয়ের র‍্যাক থেকে ধুলো ঝেড়ে বের করলাম যোগীন সরকারের বনে-জঙ্গলে, ছবি ও গল্প। ছোটবেলায় কী ভালই না লাগত বইগুলো। মনে হল খুব কাছের লোকের সঙ্গে দেখা। এই নতুন করে দেখার আগে অনেকগুলো বছর ঢুকে গেছে। আলাপ-পরিচয় তাই ঠিক আগের মতো ঝালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। কেমন যেন সুর কেটে গেছে। তখন আমার বয়েস ছিল দশ, এখন পঁচিশ। পনেরোটা বছর অনেকখানি সময়। একটা মানুষকে আগাগোড়া বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পঁচিশ বছর বয়েসে দশ বছর বয়েসের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়; নাগাল পাওয়া যায় না ছোটবেলার সেই মনটার। চেষ্টা করলাম নিজেকে হারিয়ে খোঁজার। কিছু পেলাম, ভাঙাচোরা টুকরো-টাকরা। বুঝলাম নেহাতই ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছি। এখানে সময় পনেরো বছর ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোনওদিন সেখানে ফিরতে পারব না।

"আগেই বলেছি শীত জাঁকিয়ে বসার কাছাকাছি সময়। ঘরের প্রায় সবগুলো জানলা বন্ধ। খোলা শুধু একটা। পরিপাটি বিছানা পাতা। কাল ভোরে ওঠার কথা মনে করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোবার আগে বইয়ে চোখ বোলানো অভ্যেস। সঙ্গে ছিল পাটনা স্টেশনে হুইলারের স্টল থেকে কেনা ইংরিজি ডিটেকটিভ উপন্যাস। ভাল ঘুমপাড়ানি ওষুধ। ভেবেছিলাম চোখে টান ধরলেই বেড সুইচ টিপে বাতি নিবিয়ে দেব। পাতা উলটে গেলাম বেশ কয়েকটা। কিন্তু ঘুমের নাগাল পেলাম না। বইয়ের অক্ষরগুলো মানেটানেসুদ্ধু পিছলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। পড়ছি, কিন্তু মনে কিছুই দাগ কাটছে না। বইটা রেখে উঠে পড়লাম। দাঁড়ালাম ঘরের একটিমাত্র খোলা জানলার ধারে। বাইরে চাঁদের আলো অন্ধকারকে বাড়তে দেয়নি। সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। তারপরেই একটা কুয়ো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অমনি মনের মধ্যে একটা ছায়া পড়ল। ভিজে এক ঢাল চুলের ফ্রেমে বাঁধানো মুখে একটা বেমানান হাসি নিয়ে শুয়ে ছিল একজন। পুরনো অ্যালবাম থেকে একটা ছবি আলাদা হয়ে খুলে এল। সময়ের ঘষায় এতটুকু অস্পষ্ট হয়নি। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলাম ছবিটা। পারলাম না। কেমন একটা অস্বস্তি একটু-একটু করে পেয়ে বসছে আমাকে। জ্যোৎস্নায় ধোওয়া। সেই কুয়োতলা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না। হালকা হাওয়ায় গাছপালা মাথা দোলাচ্ছে। আলো আর অন্ধকার জায়গা বদলাবদলি করছে সমানে। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া অন্য শব্দ নেই। মনে হল সারা বাগান, ওই কুয়োতলা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।

"দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম জানলাটা। আবার এসে বসলাম বিছানায়। গরম নেই ঘরের মধ্যে। তবু টের পেলাম কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেছে। আমি পঁচিশ বছরের সুস্থ সবল মানুষ একজন। ছাত্রজীবনে কবিতা লিখেছি, ছাপাও হয়েছে। কিন্তু কল্পনা কখনও এ-রকম লাগামছাড়া হয়নি। ট্যুরের চাকরি। অজস্রবার অচেনা অজানা বাংলোতে রাত কাটিয়েছি। চোর-ডাকাত ছাড়া অন্য কোনও কারণে এ-ধরনের ছমছমে অস্বস্তি বোধ করিনি। অথচ এই ঘর আমার চেনা, কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে যেটা অস্বস্তি, যে-কোনও সময় সেটাই ভয়ের চেহারা নিতে পারে। যুক্তিবাদী মনটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সব কিছুর মানে খুঁজে বের করার। একটা সময় তাকে হার মানতেই হবে। আর ঠিক তখনই জেঁকে বসবে ভয়।

"বিছানায় শুয়েও শয্যাকণ্টকী। বই সামনে ধরলেও চোখের নজর যায় পিছলে। ছাপার অক্ষর টপকে চলে যায় বন্ধ জানলাটার ওপর। অমনি মনের আয়নায় দেখতে পাই জ্যোৎস্নায় নিকোনো কুয়োতলাটা। অনেক চেষ্টা করেও এই

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বর্ষিত হয় আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

ছবিটা অন্য চিন্তা দিয়ে আড়াল করা গেল না। উলটে একটা বাড়তি ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে। যাকে ভেবে মন বারবার ছুটে যাচ্ছে কুয়োতলায়, সে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে, বন্ধ জানলার ওপাশে। হাজার যুক্তির ঝাড়ু চালিয়েই কথাটা তাড়াতে পারলাম না। এমন সময়," বলে বাবা থামলেন একটু।

"এমন সময় কী ?" বাপনের গলাটা একটু চড়ে গেল। বাবার গল্পের মধ্যে কতখানি ঢুকে গেছে নিজেই বুঝতে পারেনি।

"বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে কাঠের পাল্লার ওপর স্পষ্ট শব্দ হল ঠক্-ঠক্। পোকা নয়, মাকড় নয়। পরিষ্কার মানুষের হাতে আঙুলের উলটো দিকের গাঁট দিয়ে ঠোক্কর মারার আওয়াজ। যেন কেউ আমার নজর কাড়ার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো। আবার ঠিক মাপা দুটি টোকা জানলার ওপর। শব্দটা আমার মন থেকে যুক্তিটুক্তিকে ভাগিয়ে আমাকে ফেলে দিল ভয়ের গর্তে। সে গর্তের আবার তলা নেই। একবার তার মধ্যে পড়লে শুধু তলিয়েই যেতে হয়।

"আমি বিছানায় আধশোয়া হয়ে। বন্ধ জানলাটা থেকে কিছুতে চোখ সরাতে পারছি না। ফের শব্দ হল—ঠক্ ঠক্। সামান্য একটু বাদে আবার ঠক্ ঠক্। আপনা হতেই শব্দগুলো আমার কাছে কথা হয়ে গেল। পরিষ্কার শুনলাম। অভি—এই অভি।

"এখানে আমাকে এভাবে একজনই ডাকতে পারে। এবং সে-ই ডাকছে আমাকে। কেন একথা মনে হল বলতে পারব না। হয়তো ভয়টাকে আরও পাকাপোক্ত করবার জন্যে আমার মনই চাইছিল এই ধরনের একটা বিশ্বাসের ভিত তৈরি করতে। ভয় আর যুক্তিহীন বিশ্বাস এ ওকে আঁকড়ে ধরল আরও জোরে। বুদ্ধিবৃত্তির শেষ টিমটিমে আলোটা নিবে যেতে সেই অতল ভয়ের মধ্যে এক ধরনের নিশ্চিন্ত ভাবের অবলম্বন পেয়ে গেলাম। আর কোনও সন্দেহ রইল না : শিপ্রাদিই ডাকছে আমাকে জানলার ওপাশ থেকে। বাইরের দেওয়ালে হয়তো টিকটিকি আটকে থাকতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল আটকাবার মতো জায়গা নেই।

"আবার এল সেই ডাক। একই ধরনের। অভি, এই অভি। আমার হাত-পা অনেকক্ষণ বরফের চাদরের ওপর শুয়ে থাকলে যা হয় সেই রকম। বুকের মধ্যে ঢাক বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ঘরের টেম্পারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে গেছে। বুঝতে পারছি ঘামে সারা গা ভিজে গেছে বলে ঠাণ্ডাটা বেশি লাগছে। একবার পঁচিশ বছর বয়সী আমি মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো ঘাই মারল একেবারে নেতিয়ে পড়ার আগে। বলল : যাও না, জানলাটা খুলেই দেখো না ব্যাপারটা কী ! জানলা খোলার কথা ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। অমনি আবার নতুন করে ভয়কে ফিরে পেলাম। যুক্তি লাগসই না হলে একটা সংশয়ের খোঁচ থেকেই যায়। এই ভয় আমাকে সেই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাল।

"জানলার ওপাশ থেকে শব্দগুলো আমার কছে টেলিগ্রাফের টরেটক্কা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। শিপ্রাদি ডাকছে আমাকে : অভি, এই অভি, ওঠ্ না, দেখ্ আমি এসেছি। কখনও বলছে : তুই এতদিন পরে কেন এলি অভি। আমার একা-একা আর ভাল লাগে না।

"আমি যে কতক্ষণ একটা জ্যান্ত সিমেন্টের চাঙড় হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলাম খেয়াল নেই। সেই অদ্ভুত একতরফা সংলাপ শুনে যাচ্ছি তো শুনেই যাচ্ছি। নিজেই বুঝিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট ভয় একটা বেপরোয়া সাহসকে খুঁচিয়ে তোলে অনেক সময়। সেই সাহস আচমকা আমাকে ইলেকট্রিকের শক্ দিল। অনেকটা সময় আমাকে পাকড়ে রাখার পর ভয়ের মুঠোও বোধ হয় একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম। যা-থাকে-কপালে ধরনের একটা খ্যাপামি আমাকে গুলতি থেকে ছিটকে যাওয়া গুলি বানিয়ে দিল। আছড়ে গিয়ে পড়লাম জানলাটার ওপর। শরীরের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিলাম পাল্লাদুটো হাট করে খুলে দেবার চেষ্টায়। তাকালাম খোলা জানলা দিয়ে। দেখলাম—"

"বাপন, তোমার বাবাকে নিয়ে খেতে এসো। দেরি হলে কাবাব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" ভেতর থেকে মা ডেকে বললেন।

বাপন শুনেও শুনল না, বলল, "জানলার ওপাশে কী দেখলে বাবা ?"

"সেইটেই আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়," আস্তে আস্তে বললেন বাবা, "মনে হল শিপ্রাদিই, তেমনি চুল খোলা, আলো-অন্ধকারে মিলেমিশে আছে, তবুও পরিষ্কার শিপ্রাদি। তবে এই দেখাটা বোধহয় এক লহমার জন্যে। তবে একটা কথা," একটু হাসলেন বাবা, "আমার মন তো তাই চাইছিল দেখতে। হয়তো পুরোটাই হ্যালুসিনেশান, যার পেছনে অটো-সাজেশান থাকতেও পারে। তবে একটা কথা। এর ঠিক পরেই বুঝলাম ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ও আমার শরীর মনের চৌহদ্দি ছেড়ে পালিয়েছে। আমি বিছানায় এসে পড়া মাত্র ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।"

"কিন্তু বাবা, তোমার শিপ্রাদির ঠোঁটের বাঁ কোণের ওপরে কি একটা বড় তিল ছিল," ধাঁ করে জিজ্ঞাসা করল বাপন।

"তুই কী করে জানলি।" এবারে বাবার অবাক হবার পালা।

"না, এমনি হঠাৎ মনে হল।"

ভেতর থেকে বাপনের মা আবার খেতে ডাকলেন। বাবা মাথায় ঝাঁকি দিয়ে নিজের মনেই বললেন, "আশ্চর্য ! তোর তো সে-কথা জানার নয়।"

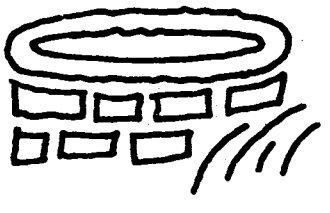

শুরু হল টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রোভার্স এক গোলে এগিয়ে গেছে ! এবারে শুরু হবে ঝড়ের মতো হামলা !

ক্রিটে ছুটি কাটাতে এসেছে রোভার্সের ছেলেরা । স্ট্যামব্রিজ সিটির সঙ্গে ফ্রেণ্ডলি ম্যাচে তারা পিছিয়ে পড়েছিল । এখন এক গোলে এগিয়ে আছে ...

হুররে !

এগোও স্ট্যামব্রিজ ! এগোও !

হারতে রাজি নই

দ্বিতীয়ার্ধে স্ট্যামব্রিজ মরিয়া হয়ে লড়ছে

স্ট্যামব্রিজ জিমিকে মারল !

উঃ !

জিমির শুশ্রূষা চলছে ...

ওরে বাবা, এ কী খেলা !

ওরা এবারে প্রথম ডিভিশনে উঠেছে তো ...

তাই সহজে হার মানবে না !

একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার !

এলিয়টকে আটকাও !

এলিয়ট ভড়কি দিয়ে সরে যেতেই ...

ডানকান বল ধরছে ...

আরে !

না, ধরেছে !

ডানকান বল বাড়াল ম্যাকের দিকে ...

রয়কে দিয়েছে !

নাও, রয় !

থ্রি টু ওয়ান !

দুর্দান্ত গোল করল !

খেলাশেষের একটু আগে মার্ভিনকে বল দিল রয় ...
হেঁটে গিয়ে গোল করল মার্ভিন !
ফোর টু ওয়ান !
খেলা শেষ ... স্ট্যামব্রিজ পর্যুদস্ত ..
নাঃ ! ওরা দারুণ খেলেছে !
এই হচ্ছে প্রথম ডিভিশনের খেলা !
রোভার্সের ড্রেসিং রুমে ...
স্টেভের এই ফর্ম থাকলে নিয়মিত নামাব !
ধন্যবাদ, রয় !
দিব্যি খেলেছ ছোকরা !
কিন্তু মনে রেখো, এখনও তুমি নবিস !
কী বুঝলে ?
ওঃ
হাহা !
হোটেলে ফিরে ...
একটু চান করে নেব !
নিশ্চয়ই !
জেরি কেমন আছে, কে জানে !
হাহা ...
কেমন খেললে তোমরা ?
আর আমরা খেটে মরছি !
তুমি তো ভালই আছ !
জেরির সঙ্গে কথা হচ্ছে রয়ের ...
জখম কেমন আছে ?
একটু ভাল !
কিন্তু সত্যি কি ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট ?
পাথরের আড়ালে একটা ছায়াকে আমি সরে যেতে দেখেছিলুম ।
তার মানে পাথর ফেলে কেউ আমাদের মারতে চেয়েছিল ?
ওদিকে হোটেলের লবিতে ...
এবারে হামলা হবে এইখানে !
NOTICE BOARD
DIKTAEAN CAVE
TOURS ARRANGED
QUALIFIED GUIDES
মজা টের পাইয়ে ছাড়ব !
কে এই লোকটা ? রোভার্সের সামনে কোন্ বিপদ এবারে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

"মা, আমিও পরেছি"

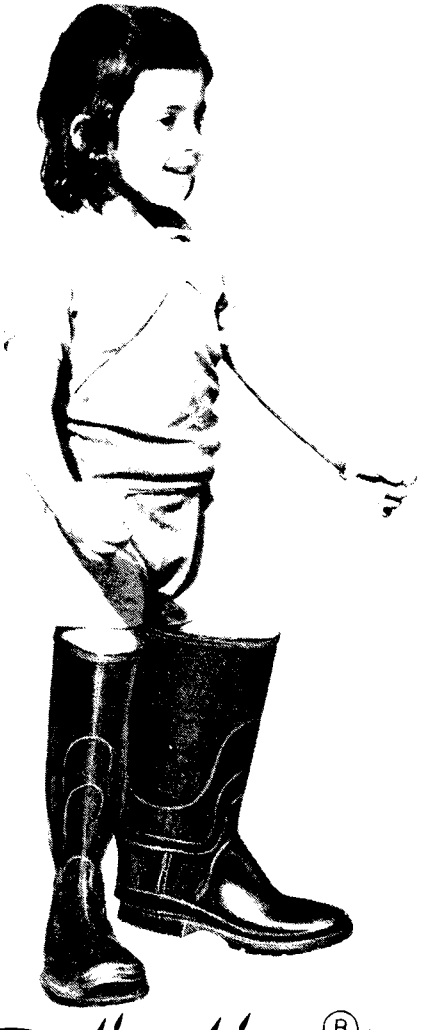

Duckback®

গ্লেজড্ গামবুট - ছোট বড় সবার জন্য

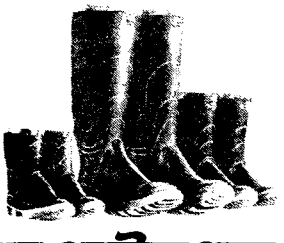

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

সবার সুরক্ষায় Duckback®

naa BWL-8475

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী সারা-জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ছেলে সায়ন এখন চা-বাগানেই আছে। একটু আগেই একটা কালো সাপ একটা খরগোশের বাচ্চাকে ধরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছে। বুধুয়ার বিশ্বাস, সাপটা এই বাংলোর পাহারাদার। কিন্তু কুমুদিনী বলেছেন, "কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দাও তোমরা" তারপর...

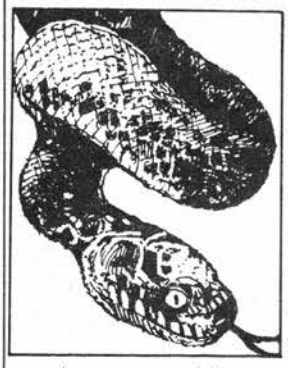

বিকেলের মধ্যে বাংলোর সব ঝোপ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুপ্রকাশ ফ্যাক্টরি থেকে কিছু মানুষ পাঠিয়েছিলেন, তারাই কোদাল-কাটারি নিয়ে হাত চালাল। ফুলগাছগুলোকে বাঁচিয়ে সামান্য আড়াল করা কম দামি গাছদের গোড়া কেটে ফেলা হল। সায়ন দেখছিল, বুধুয়া-বুড়োর মুখ খুব গম্ভীর। এই কাজটাকে সে মোটেই পছন্দ করছিল না। সায়ন তার শরীরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না ?"

"হুঁ," বুধুয়া নিশ্বাস ফেলল, "গাছগুলো ছিল গাছেদের মতো, আমরা আমাদের মতো আর সাপজোড়া আছে তাদের মতো। এটাই তো ভগবানের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেটাকে গোলমেলে করে দেওয়াটা ঠিক হল না।"

এইসময় শ্রমিকরা চিৎকার করে জানাল, তারা তিনটে গর্ত আবিষ্কার করেছে। সায়ন দূর থেকে গর্তগুলোকে দেখল। সরল সহজ গর্ত। শ্রমিকদের ধারণা, ওর মধ্যে সাপ আছে, ইঁদুরও থাকতে পারে, একটু বড়টায় খরগোশ বাসা করেছে হয়তো। এইসময় সুপ্রকাশ ফিরলেন ফ্যাক্টরি থেকে। ফিরেই হুকুম দিলেন জলে অ্যাসিড গুলে গর্তে ঢালতে। সায়ন দেখল, বুধুয়া-বুড়ো চলে গেল বাংলোর ভেতরে। এই দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সায়ন দোতলায় উঠে এল। কুমুদিনী তেমনি চেয়ারে বসে ব্যাপারটা দেখছেন। সায়নের খুব ভয় করছিল। বুধুয়া-বুড়োর কথামতো কালসাপ নিশ্চয়ই অনেক ক্ষমতার অধিকারী। ওদের গায়ে কার্বলিক অ্যাসিড পড়লে কী না কী কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে। তখন হয়তো এই বাংলোটাকে হাজার চেষ্টা করেও বাঁচানো সম্ভব হবে না। কিন্তু এইসব কথা বলার সাহস সায়নের নেই। মা বকে উঠবেন, বাবা বিরক্ত হয়ে তাকাবেন। কিন্তু বুধুয়া-বুড়োর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এখনই প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। আর সেটা ঘটার সময় মায়ের পাশে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গর্ত তিনটের মুখ সামান্য বড় করে একটু একটু করে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালা হচ্ছিল। সায়ন দেখল, সুপ্রকাশের নির্দেশে কয়েকটা লোক লাঠি হাতে কাছে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং তখনই নজরে এল সুপ্রকাশও হাতে রিভলভার রেখেছেন। বাবার ওটা খুব প্রিয় অস্ত্র।

একটা কালো আগুন যেন ছিটকে উঠল শূন্যে। আর সঙ্গে-সঙ্গে লাঠির আঘাত পড়ল সেটার ওপর। সাপটাকে চিনতে পারল সায়ন। এটাই সেই খরগোশটাকে ধরেছিল। প্রতিবাদ করতেও পারল না বেচারা। তারপরেই আর-একটা একই চেহারার সাপ ফোঁস করে উঠল গর্ত থেকে। কিন্তু সেটাও লাঠির আঘাত এড়াতে পারল না। দুটো বিশাল কালো সাপ ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে এখন। তিন-তিনটে গর্তের মধ্যে অ্যাসিড পুরে এমন করে আটকে দেওয়া হল যে, কোনও জীবিত প্রাণী আর ওখানে থাকতে পারবে না।

প্রলয় হল না, কোনও অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটল না। শুধু শ্রমিকরা মোটকা সাপ দুটোকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। সায়ন বুধুয়া-বুড়োকে খুঁজছিল। কালসাপ দুটো কেন চুপচাপ মরে গেল, বুধুয়া-বুড়ো নিশ্চয়ই একটা কারণ জানাবে। কিন্তু কাছেপিঠে বুধুয়াকে কোথাও দেখতে পেল না সে।

বিকেলের চা খাবার সময় কুমুদিনী তাঁর চাকা-ওয়ালা চেয়ারটাকে চা-টেবিলের গায়ে নিয়ে আসেন। যদিও বকুল সব কিছু এগিয়ে দেয়, কিন্তু দুধ-চিনি গুলে কাপ এগিয়ে দিতে না পারলে কুমুদিনী শান্তি পান না। সায়নের জন্যে বরাদ্দ পানীয় চা নয়, বলবর্ধক একটি পানীয়, যা তার খেতে মোটেই ইচ্ছে করে না। তবু হাতে নিতে হয়, একটু একটু করে গলায় ঢালতে বাধ্য হয় সে। আজ সুপ্রকাশকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। চায়ের কাপ হাতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। কুমুদিনী সেটা লক্ষ করে বললেন, "বাগানটা চমৎকার পরিষ্কার করেছে ওরা। সাপের ভয় আর নেই। সাধারণত জোড়ায় থাকে ওরা, দুটোই মরেছে।"

সুপ্রকাশ মুখ তুললেন, "কে মরেছে ?"

সায়নের হাসি পেয়ে গেল। মা যে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, তা বাবার কানে ঢুকছেই না। ছেলের হাসি দেখে কুমুদিনীর বিরক্তি বেড়ে গেল, "এখানে বসে কী যে আকাশপাতাল ভাবছ, ভগবান জানেন। এতক্ষণ যে-সব কথা বললাম শুনতে পাওনি ?"

সুপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, "সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে সাপ ধরার আয়োজন দেখে বলার সুযোগ পাইনি। আমাদের কয়েকদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "সাবধানে থাকতে হবে কেন ?"

সুপ্রকাশ বললেন, "সাপ বাগানে থাকলে তাকে টেনে এনে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু সাপের চরিত্র নিয়ে যে-সব মানুষ চলাফেরা করে, তাদের ধরা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর তাদের সংখ্যাও কম নয়।"

"কী ভণিতা করছ, খুলেই বলো না।" কুমুদিনীর কণ্ঠস্বরে কাঁপন এল।

সুপ্রকাশ বললেন, "কিছুদিন থেকেই কানে আসছিল এই তল্লাটের হাইওয়েতে ডাকাতি হচ্ছে। রাত গভীর হলেই নাকি

স্নেহ

নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড় মিল্ক পাউডার

স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন— চা বা কফি, দই বা মিঠান্ন বানানোর জন্যে।

স্নেহ স্কীমড় মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।

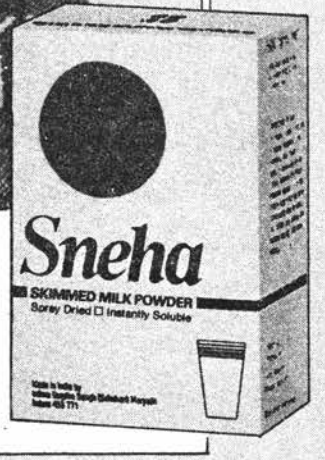

স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!

মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

গাড়ি থামিয়ে লুঠপাট করে নিচ্ছে ডাকাতরা। পুলিশ ওদের ধরতে পারছে না। এ-নিয়ে নানা তরফ থেকে ওপরমহলে নালিশ গিয়েছিল, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। একটা পুলিশ-ভ্যান প্রায় একশো কুড়ি মাইল জায়গা পেট্রলিং করে প্রত্যেক রাত্রে। ফলে কোনও একটা স্পটে একবার ভ্যান এসে চলে গেলে ডাকাতরা জানে সেই রাত্রের মতো আর ওটা ওখানে আসছে না। তা এইসব ব্যাপার হাইওয়ের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। ডাকাতি হত অজানা অচেনা গাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ ওরা হাইওয়ে ছেড়ে চা-বাগানে ঢুকেছে। গতরাত্রে নিমবিলা চা-বাগানের ফ্যাক্টরি দখল করে চা লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা। আজ স্বয়ং এস· পি· এসেছিলেন তদন্ত করতে। ডাকাতির পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা সীমান্ত পেরিয়ে ভুটানে ঢুকে গেছে। ওদিকে ভুটান আর নেপাল সীমান্ত, এদিকে ভারতবর্ষ। একবার ওদেশে পা ফেলতে পারলেই ওদের পোয়াবারো। এইরকম সমস্যায় আগে কখনও আমাদের পড়তে হয়নি।"

কুমুদিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর এই বাগানে এসে তিনি কোনও সমস্যার সামনে দাঁড়াননি। স্বামীর কথা শেষ হলে বললেন, "পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়াও। পুলিশদের বলো এখানে ঘন-ঘন আসতে।"

সুপ্রকাশ হেসে ফেললেন, "সে-সবই করা হয়েছে। আজকের রাতটা ভালয়-ভালয় কেটে গেলে ভাবছি তোমাদের শহরে পাঠিয়ে দেব। যদিও বাংলোতে কোনও টাকাপয়সা গয়নাগাটি নেই, তবু তুমি থাকলে লোকে বিশ্বাস করবে না। ফ্যাক্টরিতে যত লোক আছে, তাতে ডাকাতরা সেখানে ঘেঁষতে পারবে না।"

কুমুদিনী বললেন, "না। আমাদের এখান থেকে পাঠিয়ে তুমি একা থাকতে পারো না। যা হবার তা একসঙ্গেই হোক।"

সুপ্রকাশ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি একটা পাগল। ডাকাতরা আদৌ আসবে কি না তার ঠিক নেই, তুমি নার্ভাস হয়ে মরছ। তা ছাড়া ওরা সবে গতরাত্রে একটা বাগানে ডাকাতি করেছে, এখন চট করে কিছু করতে সাহস পাবে না। সায়ন, তুমি আম্মার সঙ্গে এসো।"

ছোট-বড় কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে সায়ন সুপ্রকাশের পিছু-পিছু যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটার দরজায় চব্বিশ ঘণ্টা তালা দেওয়া থাকে। পকেট থেকে চাবি বের করে সুপ্রকাশ দরজা খুলে আলো জ্বাললেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "এইটে হল আমাদের বংশের অস্ত্রাগার। চেয়ে দ্যাখ্, সেই প্রাচীনকালের গাদা-বন্দুক, বর্শা, তলোয়ার থেকে আরম্ভ করে ভারী পিস্তল পর্যন্ত এখানে ঝোলানো আছে। এগুলো আমার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি।"

এই ঘর সম্পর্কে সায়নের খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু তালাবদ্ধ থাকায় কোনওদিন এখানে আসা সম্ভব হয়নি। আজ চোখের সামনে অনেক রকমের প্রাচীন অস্ত্র দেখতে দেখতে সে শিহরিত হল। সুপ্রকাশ বললেন, "যদিও এইসব অস্ত্রের বেশির ভাগ আজ অকেজো হয়ে রয়েছে, তবু আমার কাছে এর মূল্য অনেক। তোকে দেখালাম, বড় হলে তুই এর যত্ন নিবি।"

সুপ্রকাশ একটা বড় বন্দুক আর কিছু টোটা তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ওঁর পকেটে এখনও সেই রিভলভারটা রয়েছে। দু' দুটো অস্ত্র নিয়ে উনি কী করবেন, সায়ন ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্ধে হয়ে গেলেই চারপাশ কেমন ছমছমে হয়ে যায়। বড় বাংলোয় আলো জ্বললেও হাওয়ারা সরাসরি পাহাড় থেকে নেমে এসে এখানেই এমন আছাড় খায় যে, মনে হয় শব্দে কানে তালা লাগল বলে। খুব কম রাতেই হাওয়ারা শান্ত থাকে আর যে-রাতে সেরকম হয়, সেই রাতে একটা বুনো-গন্ধমাখা নির্জনতা আশেপাশের পাহাড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে

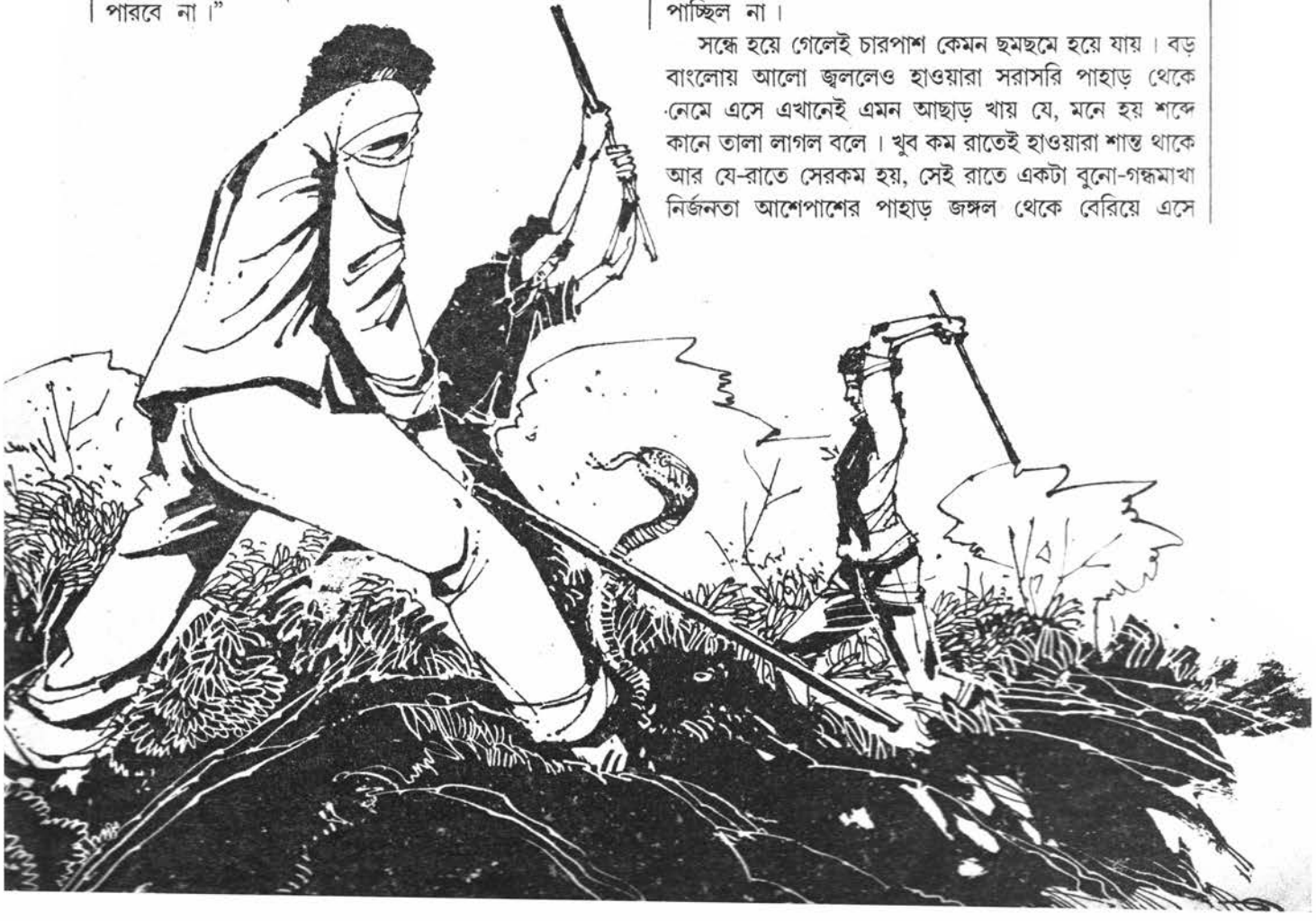

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

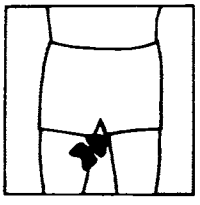

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

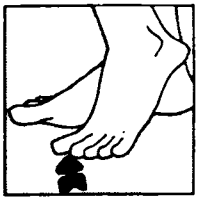

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

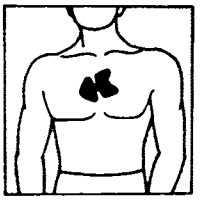

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না— উপশমের জন্য 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

1 2 3 4

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রমণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 28g.

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF — AN ESKAYEF PRODUCT
© Eskayef Limited

বাংলোটাকে থাবার তলায় ঢেকে রাখে। আজ কিন্তু সেরকম রাত নয়। হাওয়া বইছিল খুব। ধুলোমাখা হাওয়া। রাত্রে ধুলো দেখা যায় না তেমন, এই যা। সায়ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আগুন দেখতে পেল। পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বলছে। চৈত্রমাসে বনবিভাগ থেকে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। আবার আদিবাসীরাও এই কাণ্ড করে। পাহাড়ের ওপাশটা যেহেতু ভুটানের আওতায়, তাই সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না এদিকের মানুষ। কিন্তু চৈত্রমাসে সন্ধের মুখে পাহাড়ে আগুন জ্বলে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলা সেই আগুন দূর থেকে দেখতে মন্দ লাগে না। এই বাংলো থেকে হাঁটাপথে ওই আগুনের জায়গা কম করে চার মাইল হবেই। খুব ডানপিটে মানুষ ছাড়া কেউ যায় না ওদিকে। একটা শুকনো নদী পার হয়ে জঙ্গল ও খাদ ডিঙিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠার আর-একটা বিপদ হল, বিনা অনুমতিতে বিদেশী রাষ্ট্রে ঢোকার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। তাই চার মাইল বলতে দূরত্ব খুব বেশি মনে না হলেও কেউ শখ করে ওখানে যেতে চায় না।

আগুনটা জ্বলছিল বাঁ দিকে। প্রথমে একটা লাল বলের মতো মনে হচ্ছিল। ক্রমশ বলটা লম্বা হতে হতে একটা দাঁড়ি হয়ে গেল। হঠাৎ সায়নের নজরে এল, ডানদিকে আর-একটা আগুন জ্বলে উঠল। সেটা বল কিংবা দাঁড়ি নয়, অবিকল একটা গুণচিহ্ন হয়ে জ্বলছে। একপাশে দাঁড়ি অন্যপাশে গুণচিহ্ন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আকস্মিক, আগুন জ্বলতে জ্বলতে ওই চেহারা নিয়েছে, পাহাড়ের গায়ে এরকম কত কাণ্ডই তো ঘটে থাকে। তবে আজ আর কোনওখানে আগুন জ্বলছে না। শুধু ওই দুটো নিপুণ আগুন ছাড়া। নিপুণ, কারণ এত হাওয়াতেও ও দুটো নিভছে না।

"হায় বাপ, হায় বাপ।" ঠিক ঘাড়ের কাছে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠতেই সায়নের মনে হল, তার হৃৎপিণ্ড এক লাফে গলায় উঠে এসেছে। কোনওরকমে মুখ ফিরিয়ে সে বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পেল। বুধুয়া-বুড়ো এক দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের আগুন দেখছে। সায়নের খুব রাগ হয়ে গেল এইভাবে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বলে, কিন্তু তার আগেই বুধুয়া-বুড়ো বলল, "ক্ষমা নেই, কোনও ক্ষমা নেই।"

সায়ন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ তুমি?"

বুধুয়া-বুড়ো সম্মোহিত যেন, তেমনি গলায় বলল, "ক্ষমা নেই।"

সায়ন এবার ভয় পেল। বুধুয়া-বুড়োর গলার স্বরে অদ্ভুত একটা শীতলতা এসেছে, যা তাকে ভয় পাইয়ে দিল। সে দু'পা এগিয়ে বুধুয়া-বুড়োর জামা আঁকড়ে ধরল, "কী বলছ তুমি? কার ক্ষমা নেই? কে ক্ষমা করবে?"

ঝাঁকুনি খেয়ে বুধুয়া-বুড়ো দু'চোখ ঢাকল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "কালসাপ মরেছে, আর নিস্তার নেই। এবার হাওয়াদের নখ গজাবে, বাদুড়ের দাঁত লম্বা হবে। কেন মারল কালসাপ? হায়-হায়। ওই যে আগুন দেখছ ছোটাসাহেব, ওই আগুনের মানে জানো?"

"না। কী মানে?" বুধুয়া-বুড়োর শরীরের সঙ্গে প্রায় সিঁটিয়ে দাঁড়াল সায়ন।

"ক্ষমা নেই, শেষ করে দাও, আঘাত হানো।"

"বুধুয়া-বুড়ো, আমার খুব ভয় করছে।"

"ঠিক আছে। তুমি ঘরে যাও। আমি ওই কালসাপদের গর্তের কাছে গিয়ে ওদের জন্যে প্রার্থনা করে আসি।"

বুধুয়া-বুড়োকে খুব স্নেহপ্রবণ মনে হচ্ছিল। সায়ন আবার জিজ্ঞেস করল, "ওই আগুন কে জ্বেলেছে?"

"কে জ্বেলেছে? হায় বাপ! এই বাচ্চাকে আমি কী করে বোঝাই? আকাশের গায়ে আগুন দিয়ে লেখার ক্ষমতা কার থাকে। বাতাস এসে পাহাড়ে পাক খায়। তার টানে গাছের সঙ্গে গাছের ধাক্কা লাগে। সেইসময় আগুন বের হয়। সেই আগুনে কালসাপের নিশ্বাস মিশে গেলে তবেই তো ওই রকম আগুনে-চিহ্ন আঁকা হবে।" কথাগুলো বলতে-বলতে বুধুয়া-বুড়ো নীচে নেমে গেল প্রার্থনার জন্যে।

বারান্দায় দাঁড়াতে পারল না সায়ন। জোরে পা ফেলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, মা চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছেন। বাবার হাতে টেলিফোনের রিসিভার। খুব মগ্ন হয়ে কথাগুলো শুনে সুপ্রকাশ বললেন, "এই তল্লাটের শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের হাতে। গাড়ির অভাব কিংবা ফোর্স নেই বলে আপনি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। চা-বাগান আর পাহাড়ের মাঝখানে যে হাইওয়েটা, সেটাই না হয় আপনারা পাহারা দিন। আজ রাত্রের মতো এইটে, কাল ভেবেচিন্তে কিছু করা যাবে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে সুপ্রকাশ বললেন, "পুলিশও হয়েছে তেমন। এখন থেকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। কী হয়েছে খোকা? তোর মুখ অমন সাদা কেন?"

সায়ন সুপ্রকাশের পাশে এসে দাঁড়াল, "বুধুয়া-বুড়ো বলল, কালসাপ মারা হয়েছে বলে বাদুড়ের দাঁত বড় হবে, হাওয়ার নখ গজাবে।"

"কী যা-তা বকছিস?"

"হ্যাঁ। পাহাড়ের গায়ে লেখা হয়েছে: ক্ষমা নেই, শেষ করে দাও।"

"ও মাই গড!" সুপ্রকাশ চিৎকার করে উঠলেন, "ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুড়োটা যা বলল, তাই বিশ্বাস করলি? তুই না ক্লাস সেভেনে পড়িস। কোথায় কী লেখা হয়েছে, চল, আমাকে দেখাবি।"

সায়নের হাত ধরে সুপ্রকাশ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সায়ন তন্ন-তন্ন করে পাহাড়টাকে খুঁজেও আর আগুন দেখতে পেল না। সেই দাঁড়ি এবং গুণচিহ্ন মিলিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বুধুয়া-বুড়োর প্রার্থনা কালসাপরা শুনেছে। কিন্তু সে-কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না সায়ন। সুপ্রকাশ বললেন, "কুসংস্কার মানুষের ক্ষতি করে খোকা। সত্যি কী দেখেছিলি?"

"একটা দাঁড়ি আর একটা গুণচিহ্ন। আগুনের।"

"ভুল দেখেছিস। এইসময় গাছে-গাছে ঘষা লেগে পাহাড়ে আগুন জ্বলে। নতুন কোনও ঘটনা নয়। চিহ্নগুলো তুই তৈরি করেছিস, আর বুধুয়া ওইরকম ভাবিয়েছে তোকে।"

সুপ্রকাশের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় সায়ন প্রতিবাদ করতে চেয়েও করল না। সে ভুল দ্যাখেনি, কেউ তাকে ভাবায়নি। মানে যাই হোক না কেন, আগুনগুলোয় অবিকল দাঁড়ি এবং গুণচিহ্ন ছিল। (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

চরকাবুড়ি

সুখেন্দু মজুমদার

চরকাবুড়ি চরকা কাটে
চাঁদের দেশে বাস করে,
সারাটা দিন লুকিয়ে থেকে
সাদা মেঘের চাষ করে।
রাত্রি হলে কাজ শুরু হয়,
সুয্যিমামার দোর আঁটা ;
সাদা মেঘের পেঁজা তুলোয়
শেষ করে সে ওড়নাটা।
মিহিসুতোর ওড়না ওড়ে,
রুপোয় মাখা তার জরি,
খোকা-খুকুর চোখের পাতায়
স্বপ্ন আনে ঘুমপরি।
চরকাবুড়ি ছুটে বেড়ায়
দেশবিদেশে রাত্রিদিন,
সাদা মেঘের ভেলায় চেপে
নেচে বেড়ায় তাধিন্‌ধিন্‌।
চরকাবুড়ি, তুমিই বলো,
ওদের কথা সত্যি কি,
তোমার বাড়ি লোকজন নেই
ইটপাথরে ভর্তি কি ?
চরকাবুড়ি চললে বুঝি
কোথায় যাবে, দূর দেশে ?
করলে দেরি কাঁদবে খুকু
তোমার খোঁজে ঘুরবে সে।

নিট ফল

মৃণালকান্তি দাশ

মালকোশ রাগে খেয়াল শোনান,
পিলু ও বেহাগে সিদ্ধহস্ত—
মেঘমল্লারে আকাশ ভেজান,
জানি ওস্তাদ আপনি মস্ত !
দীপকে আপনি অতি সড়গড়,
এতই দক্ষ খাম্বাজ রাগে —
মঞ্চে যখন তুফান তোলেন,
ঢুলুঢুলু চোখে সকলেই জাগে।
ভৈরব রাগে কী খেয়াল গান
শুনতে এসেই শ্রীদাম নিয়োগী—
বলি তবে আজ সত্যি কথাটি,
কাল হল তার অকালবিয়োগই।
হংসকণ্ঠে হংসধ্বনি
আপনি গাইলে সোনায় সোহাগা—
গানের মহিমা কতটুকু বোঝে
শ্রীচরণদাস এই হতভাগা ?
আশাবরী শেষে সেদিন যখন
শুরু করলেন ঝিঁঝিট রাগিণী—
কান খাড়া করে বসে রইলাম,
আসনটি ছেড়ে একপা ভাগিনি।
প্রতিবার আমি করেছি চেষ্টা
গানের বিষয়ে দু'কথা বলতে—
পোড়া ঘুম এসে ভুলিয়েছে সব
ভোরে বেরিয়েছি টলতে টলতে।
আসরে যখন ঘুম পেয়ে যায়,
বাড়িতে এলাম। বলি অগত্যা—
আর কিছুদিন ও-গান শুনলে
নিট ফল হবে : আত্মহত্যা !

ছবি : দেবাশিস দেব

ছড়া দুটো

হিমাংশু জানা

॥ ১ ॥

খোঁজে কেউ ন্যাসপাতি,
চায় কেউ পেয়ারা,
দেখলেই বোঝা যায়
দুজনের চেহারা
অভিমানী একজন,
একজন বেয়াড়া।

॥ ২ ॥

দুষ্টু তারা নয় তো মোটে,
ভোর হতে-না-হতে ওঠে
উঠেই চ্যাঁচায় সাধ্যমতো,
বুঝতে কি চায় বোঝাও যত।
বিস্কুট চাই জোড়া-জোড়া।
কাঠের পুতুল টাট্টু ঘোড়া,
তিনচাকা চারচাকা গাড়ি
না দাও—কথায় কথায় আড়ি।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" লোকটা নাকি শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল, তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে সে নানা উদ্ভট খবর জানায়। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। উটকো লোকটা, আপাতত যার নাম পঞ্চানন্দ, দুজনকেই ভূতের ভয় দেখায়। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির ক্রীড়া-দক্ষতা দেখে হাতরাশগড়ের মহারাজা কোচ রেখে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চান। মহারাজার গাড়িতে দুই ভাই সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। গাড়ি থামতে তারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে বাসে ওঠে। বাসের মধ্যে মহারাজার সেক্রেটারি খুন হয়। ঘড়ি ও আংটি তাদের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মোটর-সাইকেল চায়। তারা এখন বাড়ি ফিরবে। তারপর····

দুই ভাই মোটরসাইকেল দাবড়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ একটু রাত হয়ে গেছে। বাড়ির লোক চিন্তা করতে শুরু করেছে। হরিবাবু বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে স্বগতোক্তি করছেন, "মরবে···মরবে, দুটোই একদিন বেঘোরে মরবে। ওসব বর্বর খেলার পরিণতি ভাল হওয়ার কথা নয়। ফাইনার সেন্স নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি লোপ পায়, হিংস্রতা আসে, মানুষ পশু হয়ে যায়···"

খেলাধুলো জিনিসটা যে এত খারাপ তা পঞ্চানন্দ জানত না। সে খুব গম্ভীর মুখে হরিবাবুর পিছু-পিছু পায়চারি করছিল। আর মাঝে-মাঝে "খুব ঠিক কথা", "বেড়ে বলেছেন", "সে আর বলতে"—এইসব বলে যাচ্ছিল।

হরিবাবু তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "তুমি তো অনেক ফিকির জানো। ছেলে দুটোর কী হল একটু দেখবে?"

পঞ্চানন্দ বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে বৃথা ভেবে মরছেন। আপনার ছেলে দুটো তো আর দুধের খোকা নয়। ঠিক ফিরে আসবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিবাবু বললেন, "দুধের খোকা যে নয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। দুটোই ভয়ংকর রকমের ডাকবুকো গুণ্ডা। প্রায়ই মারপিট করে আসে। ওদের শত্রুর অভাব নেই। তারা কেউ যদি গুম-খুন করে বসে, তা হলে কী হবে?"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "তা হলে তো খুবই মুশকিল।"

হরিবাবু একটু কঠিন চোখে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, "ওবেলা তো দিব্যি খ্যাঁট চালালে।"

পঞ্চানন্দ বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে সে আর বলতে। মাংসটা কিন্তু মশাই খুব জমে গিয়েছিল। আর-একটু ঝাল হলে কথাই ছিল না। তারপর ধরুন পোলাওয়ের কথা। তারটা খুব উঠেছিল বটে, তবে কিনা জাফরান না পড়লে পোলাও ঠিক যেন পোলাও-পোলাও লাগে না। তবে ফুলকপির রোস্ট গিন্নিমা একেবারে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন বটে···"

হরিবাবু কঠিন গলায় বললেন, "খ্যাঁট ফের এ-বেলাও তো চালাবে।"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে হিমালয়ে গিয়ে যখন থাকি, তখন দিনান্তে একটা পাকা হনুকি ছাড়া কিছুই জোটে না। এই আপনাদের কাছে যখন আসি-টাসি, তখনই যা আজ্ঞে, একটু ভালমন্দ জোটে। বলতে নেই আজ্ঞে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এ-বেলাও একটু খ্যাঁট চালানোর ইচ্ছে আছে।"

"তা চালাবে চালাও, কিন্তু বসে-বসে খাওয়া আমি অপছন্দ করি। যাও গিয়ে ছেলে দুটোর একটা হদিস করে এসো।"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "প্রস্তাবটা মন্দ নয়। হাঁটাহাঁটি দাপাদাপি করলে খিদেটাও চাগাড় দিয়ে উঠত। কিন্তু মুশকিল কী জানেন! আপনার ছেলেদের তো আমি চিনি না। আপনাদেরই সব ছোট-ছোট দেখেছি। সেই আপনারা বড় হলেন, ছেলের বাপ হলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। ভাবি দুনিয়াটার হল কী!"

হরিবাবু যথেষ্ট রেগে গলা রীতিমত তুলে বললেন, "ওসব বাজে কথা ছাড়ো। তুমি না চিনলেও ঘড়ি আর আংটিকে তল্লাটের সবাই চেনে। জিজ্ঞেস করে-করে খোঁজ নাও। শুনছি, কোনও রাজা নাকি তাদের নিয়ে গেছে।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলে, "রাজা! এ তল্লাটে আবার রাজা-গজা কে আছে বলুন তো?"

"সে কে জানে। হাতরাশগড়ে একসময়ে রাজা ছিল একজন। সে কবে মরে হেজে গেছে। তা সে জমিদারি রাজত্বও কিছুই তো আর নেই। সব জঙ্গল হয়ে আছে। তাই ভাবছি হাতরাশের রাজা আবার কে এল ঘড়ি আর আংটিকে নিয়ে যেতে! কোনও বদমাশের পাল্লায় পড়ল না তো!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "আজকাল গুণ্ডা-বদমাশের অভাব কী! চারদিকেই তো তারা—"

হরিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "সেইজন্যই তো খোঁজ নিতে বলছি।"

"যাচ্ছি আজ্ঞে।"

তবে পঞ্চানন্দকে যেতে হল না। বারান্দা থেকে সে সবে সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় বিকট শব্দে হুড়মুড় করে একটা বিশাল মোটরসাইকেল এসে গা ঘেঁষে ব্রেক কষল। পঞ্চানন্দ সড়াত করে পা টেনে নিয়ে বলল, "বাপ রে!"

হরিবাবু কটমট করে ঘড়ি আর আংটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বিকট হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কোথায় ছিলি?"

ঘড়ি আর আংটি খুবই দামাল আর দুরন্ত বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তাদের নিরীহ কবি-বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। হরিবাবু তাদের কখনও মারধর করেননি, এমনকী

বকাঝকাও বিশেষ করেন না। বলতে কী, ছেলেদের খোঁজ-খবরই তিনি কম রাখেন। তবু ঘড়ি আর আংটি বাপের সামনে পড়লে কেমন যেন নেংটি ইঁদুরের মতো হয়ে যায়।

দুই ভাই মোটরসাইকেল থেকে নেমে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

"কোথায় গিয়েছিলি ? মোটরবাইকই বা কোথায় পেলি ? কতবার বলেছি না মোটরবাইক, সাইকেল, এসব হল শয়তানের চাকা ? দু' চাকায় যে গাড়ি চলে তাকে কোনও বিশ্বাস আছে ?"

ঘড়ি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "আমরা একটু এই এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।"

কথাটা মিথ্যে, তবে ঘড়ি জানে তাদের বাবা খুব ভিতু মানুষ। তারা যে বিপদে পড়েছিল, সে-কথা বললে বাবার সারা রাত আর ঘুম হবে না।

হরিবাবু অত্যন্ত সন্দিহান চোখে মোটরবাইকটার দিকে চেয়ে বললেন, "ওটা কার ?"

"আমাদের এক বন্ধুর। রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় চেয়ে এনেছি।"

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "ওটা ফেরত দেওয়ার সময় ঠেলে নিয়ে যাবে। খবর্দার চাপবে না। মনে থাকবে ?"

ঘড়ি ঘাড় কাত করে বলল, "থাকবে।"

"এখন যাও। তোমাদের মা খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। জরি, ন্যাড়া সব খুঁজতে বেরিয়েছে তোমাদের।"

হরিবাবুর পিছন থেকে পঞ্চানন্দ দুই ভাইকে দেখে নিচ্ছিল ভাল করে। মুখে বিগলিত হাসি। ঘড়ি আর আংটি ঘরে চলে যাওয়ার পর সে বলল, "বেশ দুষ্টু-দুষ্টু আর মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে হয়েছে খোকা দুটি।"

হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাল্টে দুই ভাই নিজেদের ঘরে যখন মুখোমুখি বসল, তখন দু'জনেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

আংটি বলল, "দাদা, এখনও আমি ঘটনাটি কিছু বুঝতে পারছি না।"

ঘড়ি প্রথমে উত্তর দিল না। ভ্রূ কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমিও না।"

"সেক্রেটারিকে কে মারল, কেন মারল, তা আন্দাজ করতে পারিস ?"

"দূর ! কী করে আন্দাজ করব ? শুধু মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ গুলি করেছে।"

"সেক্রেটারি বাসে করে যাচ্ছিল কোথায় ? আমাদের খোঁজ নিতে নয় তো !"

ঘড়ি হাত উল্টে বলল, "কে জানে ! নরনারায়ণই বা আমাদের পাকড়াও করেছিল কেন তাও তো বুঝতে পারছি না।"

সমস্যার কোনও সমাধান সহজে হওয়ার নয় বুঝে ঘড়ি আর আংটি সোজা দাবার ছক পেতে বসে পড়ল।

দাবা খেলায় দুজনেই ওস্তাদ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কোনও সমস্যায় বা বিপদে পড়লে ঘড়ি সবসময়ে এক বা দুই পাট্টি দাবা খেলে নেয়। তাতে তার মনের ভাবটা সহজ হয়ে যায়।

হরিবাবু দাবা খেলা পছন্দ করেন না, তাস খেলা দু' চোখে

দেখতে পারেন না। তাই দুই ভাই গোপনে বসে দাবা খেলে।

* * *

ওদিকে ছেলেরা বাড়ি ফিরে আসায় হরিবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পঞ্চানন্দকে বললেন, "ওহে পঞ্চানন্দ, ইয়ে, আমার ঘরে চলো গিয়ে একটু বসি।"

"তা চলুন। বসতে আর আপত্তি কী ?"

"ইয়ে বলছিলাম, আজ সন্ধেবেলায় ইয়ে একটা ওই লিখেছিলাম আর কি।"

"জিনিসটা একটু ভেঙে বলুন। কথা সবসময়ে খোলসা করে বলবেন, তাতে মনটা পরিষ্কার থাকে।"

"ইয়ে একটা কবিতা আর কি।"

"কবিতা ? তা সে-কথা বলতে অত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন বলুন তো। কবিতা তো ভাল জিনিস। কবিতা ঝুড়ি-ঝুড়ি লিখে ফেলবেন। যত লিখবেন ততই ভাল।"

হরিবাবু খুব লাজুক মুখে বললেন, "না ইয়ে বলছিলাম কী, তোমাকে গোটাকয় শোনাব। হয়েছে কী জানো, এ-বাড়িতে কবিতার ঠিক সমঝদার নেই। আমার স্ত্রী তো কবিতার খাতা পারলে উনুনে দেন। জরিটার নাকি কবিতা শুনলেই তেড়ে জ্বর আসে। ন্যাড়াটা তো গাধা। আর আমার পিসি তো কানে শোনেন না।"

পঞ্চানন্দ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কবিতা শুনব সে তো ভাল কথা। কিন্তু মশাই,আমার আবার একটু বিড়ি-টিড়ি না হলে এসব দিকে মেজাজটা আসে না। দুটো টাকা দিন, ঝট করে মোড়ের মাথা থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা ম্যাচিস নিয়ে আসি।"

হরিবাবু দিলেন, এবং বললেন, "তুমি খুব ঘড়েল।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

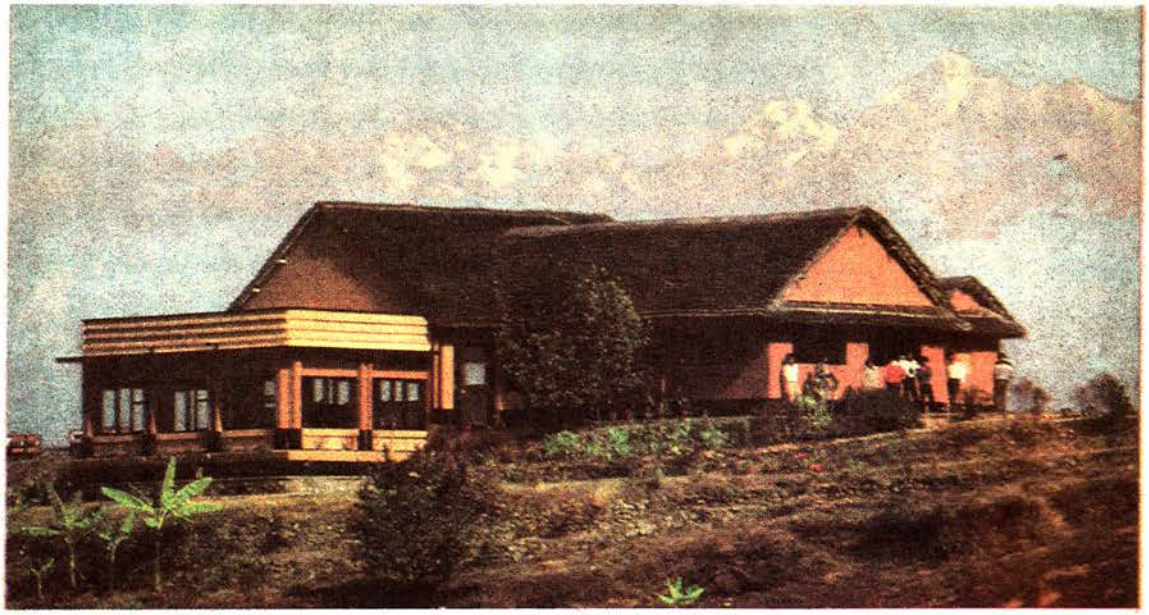

ধূলিখেল। পিছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে তুষারমৌলি পর্বতমালা

কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি

সুমন্ত্র বসু

"কী ভুতুড়ে জায়গা রে বাবা !" সঙ্গীদের একজন বলে উঠল। ভুতুড়ে পরিবেশই বটে ! আমরা যেখানে বসে রয়েছি সেটি একটি প্রায়-অন্ধকার ডাইনিং-রুম। ঘরটিতে আলোর একমাত্র উৎস খাবার-টেবিলের ওপর দুটি বড় সাইজের জ্বলন্ত মোমবাতি। ডাইনিং-রুমের কাঁচের দেওয়ালের বাইরে থেকে অনবরত ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে আওয়াজ ; মাঝেমধ্যে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের কর্কশ ডাক। বাংলাদেশের পাড়াগাঁর সঙ্গে কোনও পার্থক্যই নেই বোধহয়। কিন্তু তফাত যে আছে, তা বোঝা যায় কেবলমাত্র ডিনার শেষ করে ডাইনিং-রুমের বাইরে তারা-ভর্তি আকাশের নীচে দাঁড়াবার পর। তখন দেখতে পাই, রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে জেগে রয়েছে বিশাল-বিশাল সব পর্বতশৃঙ্গ। আর দূর দিগন্তে জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকমক করছে লোটসে কিংবা লাকপা দর্জির আকাশচুম্বী চূড়া।

নেপালের বৃহত্তম প্যাগোডা। ভক্তপুর

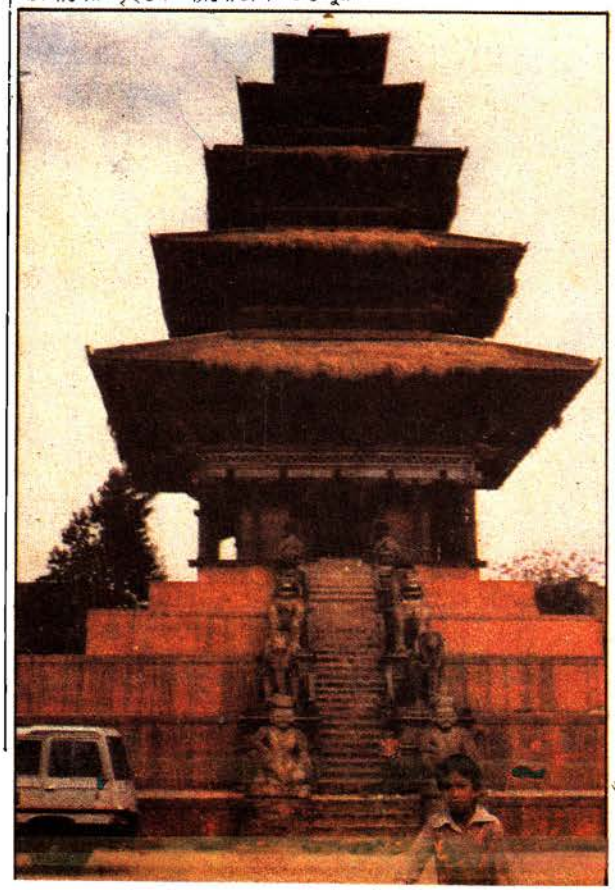

পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে গেলে মনটা আপনা থেকেই উদাস আর কবি-কবি হয়ে ওঠে। যেমন নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট ধূলিখেল মাউন্টেন রিসর্ট। কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা হাইওয়ে চলে গেছে এক্কেবারে সেই চিন-সীমান্ত অবধি ; পথের পাশেই পড়ে এই মনোরম হলিডে-স্পটটি। নেপালে যেসব ট্যুরিস্ট বেড়াতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই দিনকয়েক কাঠমাণ্ডুতে ঘোরার পর চলে যান পোখ্‌রা, নগরকোটে। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, রাজধানী থেকে দু'পা এগোলেই আছে এমন একটি জায়গা। যেখানে একবারটি গেলে বারে-বারে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। থাকবার বন্দোবস্তও নেহাত মন্দ নয়—কারণ মাউন্টেন রিসর্টে রয়েছে বেশ কয়েকটি সুন্দর-সুন্দর কটেজ যার এক-একটিতে তিন-চারজনে আরামসে থাকতে পারে।

ধূলিখেলে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল চারটে। সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। সেই আলোয় চারদিকের অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন আরও অপার্থিব হয়ে

উঠেছে। একজন কিঞ্চিৎ বয়স্ক সঙ্গী তো বলেই ফেললেন, "রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় এসে বাকি জীবনটা কাটাব জেনে গেলাম।" যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন-পাইনের ঘন বন, দূরে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের কোনও এক তুষারশৃঙ্গ। সব মিলিয়ে মনটা সত্যিই যেন কেমন হয়ে যায়। বিভূতিভূষণের ভাষায় বলতে হয়, "স্থানটির রহস্য এবং গাম্ভীর্য্যের ভাব অবর্ণনীয়।" এরকমই একটি জায়গায় একটা পাহাড়ের গায়ে তৈরি করা হয়েছে হলিডে রিসর্ট। সারে-সারে উঠে যাচ্ছে ছোট-ছোট কটেজ, তাদের মাঝে-মাঝে রয়েছে কেয়ারি-করা বাগান, যেখানে ফুটে আছে হাজারো রকমের হরেক রঙের ফুল।

ধূলিখেল মাউন্টেন-রিসর্টের ম্যানেজার এক সুদর্শন নেপালি তরুণ। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছি, চোখে পড়ল মসৃণ সমতল টেরাস, যেখানে অতিথিদের চা-খাবার জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। দলের ফোটোগ্রাফি-বিশারদরা কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছে ক্লিক-ক্লিক শব্দ। সত্যি, ফোটোগ্রাফের স্বর্গ এই ধূলিখেল। ক্যামেরা-পর্ব চুকলে সবাই বসে গেল টেরাসে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিমুখ নেপালি বেয়ারার হাতে এসে গেল গরম-গরম চা।

আমাদের দলের প্রত্যেকেই কলকাতার বাসিন্দা। তাই ধূলিখেলের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, এই নির্জনতা, এই নিস্তব্ধ নীরবতা একটু গা ছমছম ঠেকছিল বইকী! টেরাসে বসে গল্পগুজব করছি, এমন সময়ে এসে পৌঁছলেন এক কানাডিয়ান দম্পতি। সঙ্গে মধ্যবয়স্ক এক নেপালি গাইড। বোধকরি আমাদের বাংলায় বাক্যালাপ করতে শুনেই অকস্মাৎ আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন গাইডটি, পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, "কী, কেমন লাগছে ধূলিখেল?" নেপালি গাইডের মুখে বাংলা শুনে চমকে উঠেছিলাম আর কি! কথায়-কথায় জানা গেল, গাইডটির নাম নরেন্দ্র শ্রেষ্ঠা। বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার কলেজে পড়াশুনা করেছেন পর্যন্ত। ভদ্রলোক ভারী অমায়িক স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে বসে চা খেলেন, প্রচুর শুদ্ধ বাংলা বলে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। আর বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন—"ভারী ভাল জায়গায় এসেছেন, ধূলিখেলের মতো রমণীয় জায়গা খুব কমই আছে।" ধূলিখেলে এসেছি মাত্র ঘণ্টা-দুই, কিন্তু এরই মধ্যে জায়গাটিকে আমাদের এত ভাল লেগে গেছে যে, আমরা সব্বাই নরেনবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলাম।

আড্ডায় মশগুল হয়ে গিয়ে টের পাইনি, কখন যেন সূর্য ঢাকা পড়েছে পাহাড়ের আড়ালে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে হাড়-কাঁপানো শীত। এসব জায়গায় বেশি রাত অবধি বাইরে থাকা যায় না। বাঞ্ছনীয়ও নয়। সুতরাং সকলে ঠিক করল যে, ডানহাতের কাজটা শেষ করে গরম লেপের তলায় আশ্রয়গ্রহণ করাই শ্রেয়। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা গেলাম রিসর্টের খাবার-ঘরে ডিনার খেতে। চিকেন কারি তো কলকাতায় হামেশাই খাচ্ছি। কিন্তু মোমবাতির আলোয় নিঝুম পরিবেশে সেই খাওয়াকে মনে হল যেন অমৃত। আর কটেজে ফিরে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা এমনই সম্পূর্ণ যে একখানা পিন ফেললেও

গোল্ডেন গেট। পাশেই পঞ্চান্ন-জানালাওয়ালা প্রাসাদ

বুঝি তা নিঃশব্দতাকে খান-খান করে দেবে।

পরদিন কাকভোরে ঘুম ভাঙল অনেকগুলি স্বরের একটানা আওয়াজে, "বাতি কা ঝিলমিল দেউশি রে, ভাই হো মেরা দেউশি রে।" বিছানায় শুয়ে ভ্রূ কুঁচকে ভাবলাম, এটা আবার কী? কারাই বা বলছে? এরই মধ্যে বেড টি হাতে কটেজের দরজায় টোকা দিল বেয়ারা। অগত্যা তাকেই জিজ্ঞেস করলাম—এত হৈচৈ কেন? কী হয়েছে? উত্তরে সে জানাল, আজ নেপালে ভাইদের উৎসব, তাই রিসর্টের ঠিক নীচে অবস্থিত ছোট্ট ধূলিখেল গ্রামটিতে বোনেরা তাদের ভাইদের মঙ্গলকামনা করছে। শুনেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল—আরে! আজ তো আমাদেরও ভাইফোঁটা! ভালই হল, নেপালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেমন করে

পর্যটকদের জন্য কটেজ। ধূলিখেল

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!
সুপার
রিন
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের

পালিত হয় দেখা হয়ে যাবে। চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেলাম ক্যামেরা হাতে। কিন্তু ততক্ষণে ভাইফোঁটা-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। তবুও আমাকে দেখে গ্রামের ছোটদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। ওরা আমাকে ওদের বাড়িঘর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল। নেপালের গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি সাধারণত তিনতলা হয়ে থাকে—একতলায় রান্নাঘর ও খাবার-ঘর, দোতলায় শোবার ঘর এবং তিনতলায় ধান প্রভৃতি শস্য জমিয়ে রাখবার জায়গা। প্রতিটি বাড়ির ঢালু ছাদ, টালির তৈরি। গ্রামের যিনি মোড়লজাতীয় তিনি আবার নেপালের 'রয়েল হাণ্টার'। বুঝলাম নেপালের রাজা বীরেন্দ্র তাঁকে কাছেপিঠে জঙ্গলে জীবজন্তু শিকার করবার অধিকার দিয়েছেন। তিনি আমাকে তাঁর শিকার-করা লেপার্ডের মাথা, পাহাড়ি ভালুকের গায়ের ছাল ইত্যাদি দেখালেন। নেপালের গ্রাম্য মানুষের মনোমুগ্ধকর একটুখানি ছোঁয়া পেয়ে যখন রিসর্টে ফিরলাম, তখন আমার সঙ্গীরা ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘুরতে বেরুলাম অনেকে মিলে। বয়স্কদের কেউ-কেউ অবশ্য রিসর্টের বাগানে বসে চারদিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করাই মনস্থ করলেন। পাহাড়ি পথের উঁচু-নিচু দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাত্র চল্লিশ মাইল দূরেই তিব্বত-চিনের সীমান্ত। একদিকে উঠে যাচ্ছে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। মাঝে-মধ্যে পাশ দিয়ে হুশ্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে রয়েল নেপাল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস, তার অনেক আরোহীই আগন্তুকদের দিকে অবাক চোখে ফিরে-ফিরে দেখছে। আর আমরা ? মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছি পূর্ব হিমালয়ের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখতে, ক্যামেরায় তুলে নিচ্ছি ছবি। আবার মনে পড়ছে বিভূতিভূষণকে—"অভিজ্ঞতা না থাকলে বলে বোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।"

দুপুর আড়াইটে। চমৎকার মিৎসুবিসি ট্যাক্সিতে ফিরে চলেছি কাঠমাণ্ডু। ধূলিখেল ছেড়ে এসে সকলেরই মন খারাপ। এমন সময় গাড়ির নেপালি ড্রাইভার (যার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছিল) বলে বসলেন—নেপালে এলেন, ভক্তপুর দেখবেন না ? আমরা বললাম, সেটা আবার কী ? ড্রাইভার বললেন—সে কী, ভক্তপুর চেনেন না ? ষোড়শ শতাব্দীতে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল—কাঠমাণ্ডু, পাটন আর ভক্তপুর। এই ভক্তপুর ট্যুরিস্টদের কাছে কাঠমাণ্ডু বা পাটনের মতো সুপরিচিত না হলেও ওখানে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই আছে। কাঠমাণ্ডু ফেরার পথেই পড়বে। শুনে তো আমরা হই-হই করে উঠলাম, ভক্তপুর তাহলে দেখতেই হচ্ছে!

ভক্তপুরের দরবার স্কোয়ারে ঢুকে তো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত কিছু দেখবার, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা দেখি, ভেবে পাই না। কাঠমাণ্ডু শহরের মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরেই যে এমন একটি আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে, তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। আমাদের বন্ধু ড্রাইভারটি কিন্তু ইতিমধ্যেই গাইড এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে নিয়েছেন। যাত্রীদের এহেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "চলুন, এখানে একটি বিখ্যাত ঘণ্টা আছে, আগে সেটাই দেখা যাক।"

"ভক্তপুরের বাৎসল্য-মন্দিরের গায়ে লাগানো এই 'বার্কিং-বেল' সারা নেপালে বিখ্যাত। এটি নির্মাণ করেন রাজা ভূপতীন্দ্র মল্ল ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ।" একজন গাইড একদল সাহেব-মেমকে ঘন্টার ইতিহাস সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছিলেন, আমরাও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কিছুটা শুনে নিলাম। ঘণ্টাটি পিতলের তৈরি এবং আয়তনে বিশাল। স্থানীয় লোকের মুখে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে এই ঘণ্টার শব্দ নাকি মৃত্যুর শব্দের প্রতিফলন। ঘন্টাটা বাজলেই নাকি ভক্তপুরের সমস্ত কুকুর তুমুল ডাকাডাকি লাগিয়ে দেয়। সেজন্যেই এটিকে বলা হয় 'বার্কিং-বেল।' আমি শখ করে ঘণ্টাটা বাজাতে গেলাম, কিন্তু জিনিসটার ওজন অন্তত কয়েক হাজার পাউণ্ড। সুতরাং ছবি তুলেই ক্ষান্ত হতে হল।

তারপর যে আমরা কত কী দেখলাম ভক্তপুরে! দরবার স্কোয়ার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ দেখি যে আর একটা ছোট চতুষ্কোণে ঢুকে পড়েছি সবাই। এখানেই রয়েছে নেপালের বৃহত্তম প্যাগোডা, নাম তার 'নায়াটাপোলা'। নির্মাণ করেছিলেন রাজা ভূপতীন্দ্রই, ১৭০৮ সালে। 'নায়াটাপোলা' কথাটির অর্থ পাঁচতলা-বিশিষ্ট। বাস্তবিকই, মন্দিরটির রয়েছে পাঁচটি তলা। সিঁড়ির মুখে খাড়া দাঁড়িয়ে দেবতাকে পাহারা দিচ্ছে পাথরের একজোড়া 'বাঘিনী-সিংহিনী'। তাদের উগ্র দাঁত বের-করা চেহারা দেখে তো ভয়ই পেয়ে গেল ছোটদের অনেকে। এক মার্কিন দম্পতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মন্দিরটিকে দেখছিলেন আর ছবি তুলছিলেন। তাঁরা বললেন যে, নেপালের বিশ্ববিখ্যাত প্যাগোডা স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই 'নায়াটাপোলা'। অদূরেই রয়েছে আরও কয়েকটি হিন্দু মন্দির। যেমন, ভৈরবনাথের মন্দির, পশুপতিনাথের মন্দির। (এটি কাঠমাণ্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরের একটি রেপ্লিকা।)

এর পরেই চোখে পড়ল ভক্তপুরের নামজাদা 'গোল্ডেন-গেট' বা 'স্বর্ণ-প্রবেশদ্বার।' এই দরজাটি আগাগোড়া সোনার তৈরি। সোনার ওপরেই মধ্যযুগীয় ভাস্কর সুনিপুণ হাতে নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য খোদাই করেছেন। গেটের লাগোয়া মন্দিরটির নাম দত্তাত্রেয়র মন্দির। এটি অতীব প্রাচীন, রাজা যক্ষ মল্ল নির্মাণ করেছিলেন ৫৫০ বছর আগে, ১৪২৭ সনে। প্রাসাদটিতে রয়েছে ৫৫টি জানালা। এতগুলো জানালা থাকার অর্থ আমরা অনেক ভেবেও বার করতে পারলাম না।

নায়াটাপোলার উলটো দিকের মন্দিরটিকে নেপাল ট্যুরিজম্ কর্তৃপক্ষ রেস্তোরাঁ বানিয়েছেন। সাইট-সিইং করে করে সকলেই ক্লান্ত ; সুতরাং আমরা ঠিক করলাম যে বৈকালিক চায়ের আসরটা ভক্তপুরেই সেরে ফেলা যাক। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে উঠে গেলাম প্রাচীন মন্দির-কাম-আধুনিক রেস্তোরাঁর তিনতলায়। যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয় বলে দলের কেউ-কেউ অবশ্য খেলেন না। চায়ের কাপের ওপর বসেছে আড্ডার জমাটি আসর, এমন সময় নীচে থেকে কানে ভেসে এল আমাদের মিৎসুবিসির ড্রাইভারের ডাক, "সাব চলুন। আর দেরি করবেন না। তাহলে কাঠমাণ্ডু পৌঁছতে বড্ড রাত হয়ে যাবে।"

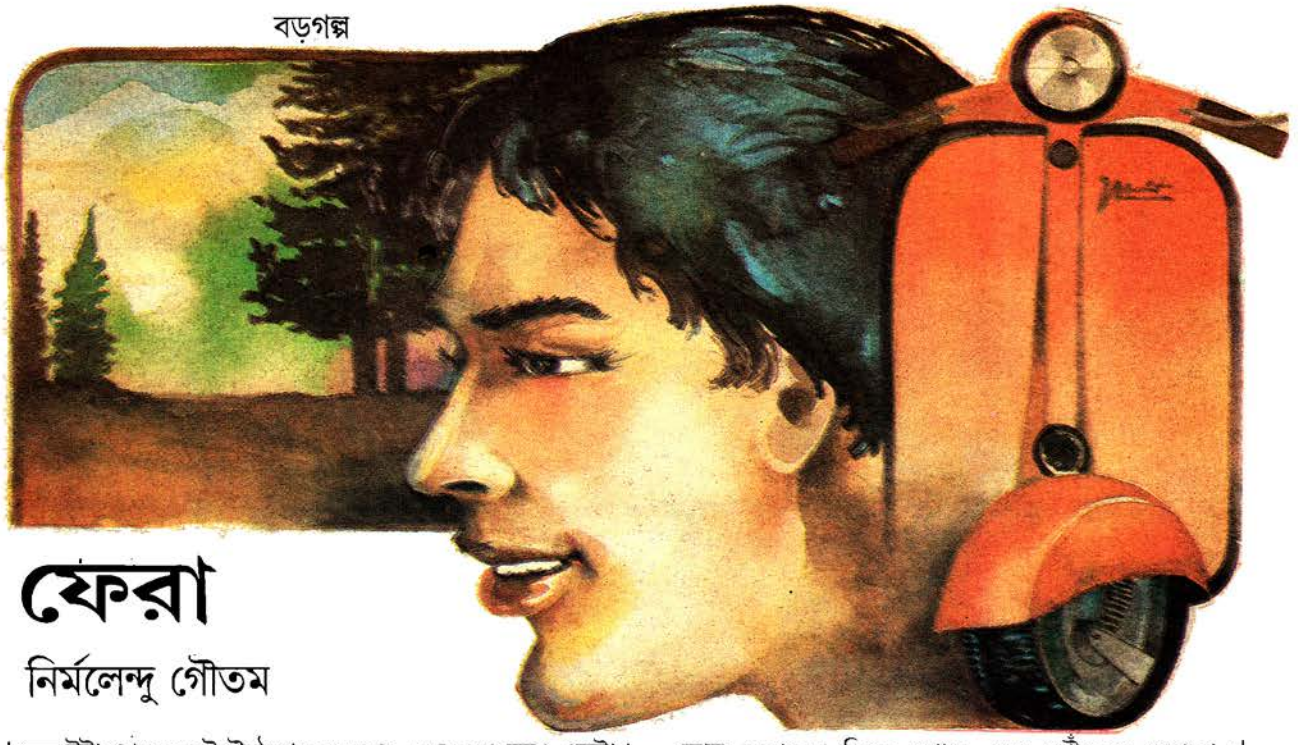

ফেরা

নির্মলেন্দু গৌতম

বইটা শেষ করেই উঠে পড়ল সুজয়। মস্ত বড় করে একটা হাই তুলল তারপর। ফিরে দেখল, প্রিয়তোষকাকা আর বাবা এখনও ডুবে আছেন ঘুমের মধ্যে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হবার পর ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলেন বাবা আর প্রিয়তোষকাকা। সে গল্প দুজনকেই শেষ পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে নিয়ে চলে গেছে।

সুজয়কে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলেন বাবা। সুজয় বিছানার ধারেকাছেও যায়নি। এখানে আসবার সময় একটা গল্পের বই ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে এসেছিল সুজয়। জানালার কাছে প্রিয়তোষকাকার আরাম চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে সেই গল্পের বইটা পড়তে শুরু করেছিল।

এতক্ষণ সেই বইটার মধ্যেই ডুবে ছিল সুজয়। কোথা দিয়ে সময় ফুরিয়েছে, টেরই পায়নি।

হাতদুটো ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুজয়। বিকেল নেমে পড়েছে ছবির মতো। চারদিক থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। তার ভেতর থেকেই তীক্ষ্ণ হয়ে জেগে উঠছে ঝিঁঝির ডাক। কেমন যেন একটা নির্জনতা চারদিকে।

এগিয়ে এসে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সুজয়। বাঁ দিকে কয়েকটা বাড়ি। ফরেস্ট কোয়ার্টার্স সেগুলো। তারপর থেকেই বলতে গেলে জঙ্গল শুরু হয়েছে। সামনের রাস্তাটা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। কত দূর গেছে এখনও সুজয় তা জানে না।

রাস্তার ওদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরই ঝোপঝাড়, ছোট গাছপালা। সেই গাছপালা ঝোপঝাড়ই ঘন হয়ে চলে গেছে। ছায়া ঘন হয়ে আছে সেখানে। একবার এই জঙ্গলের মধ্যে যত দূর যাওয়া যায়, যেতে হবে। মনে মনে ভাবল সুজয়। এখানে, এই ফরেস্ট বাংলোয় বসে বসে সময় কাটানোর কোনও মানেই নেই।

আজ সকালের দিকে এখানে এসে পৌঁছেছে সুজয়রা।

প্রিয়তোষকাকা ভোর-ভোর সময়ে জিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে দিয়ে। কথাই ছিল, ড্রাইভারকে দিয়ে জিপ পাঠাবেন প্রিয়তোষকাকা, সুজয়রা সেই জিপেই প্রিয়তোষকাকার ফরেস্ট বাংলোয় আসবে।

প্রিয়তোষকাকা বাবার মাসতুতো ভাই। মাস-তিনেক আগে ডুয়ার্সের এই রেঞ্জে বদলি হয়ে এসেছেন। এসেই একদিন চলে গিয়েছিলেন সুজয়দের ওখানে। বর্ষা চলছিল তখন। তাই আর আসবার জন্যে বলেননি। ডুয়ার্সের জঙ্গলে বর্ষায় গিয়ে বন্দী হয়ে থাকবার কোনও মানেই নেই। বলেছিলেন প্রিয়তোষকাকা।

তিন মাসের মধ্যে বাবাও আর সময় পাননি। সুজয়েরও পরীক্ষা-টরিক্ষার ব্যাপার ছিল। গত সপ্তাহে প্রিয়তোষকাকা গিয়ে এখানে আসবার ব্যাপারটা ঠিক করে এসেছিলেন। তাই ঠিক ভোর-ভোর সময়ে প্রিয়তোষকাকার জিপ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে।

জঙ্গলের পথে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে সুজয়, কিন্তু এমনিভাবে জঙ্গলের ভেতর এসে এমন চমৎকার একটা ফরেস্ট বাংলোয় থাকা এই প্রথম। কোনও সুযোগই ছিল না থাকবার। অফিস থেকে দিন-কয়েকের ছুটি নিয়ে এসেছেন বাবা। সুজয়ের টেস্ট হয়ে গেছে। রেজাল্ট বেরোতে এখনও দিন-সাতেক বাকি। কাজেই আপাতত আর কোনও ভাবনাই নেই সুজয়ের।

বিকেলের দিকে তাকিয়ে এই রকম একশো কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে হল সুজয়ের। নীচে দু'পাশের ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা গেট পর্যন্ত চলে গেছে। রাস্তাটাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে ওপর থেকে। সুজয় নীচে নেমে এল। নেমে আসতেই চোখে পড়ল, নীচে একটা স্কুটার দাঁড় করানো। আসবার সময় জিপ থেকে নেমে প্রায় ছুটেই ওপরে উঠে এসেছিল সুজয়।

সেজন্যেই বোধহয় তখন ওখানে দাঁড় করানো স্কুটারটা চোখে পড়েনি।

নিশ্চয়ই এটা প্রিয়তোষকাকার স্কুটার। যদি একবার স্কুটারটা চালিয়ে বেড়িয়ে আসা যায়? চারদিকে ঘন বন। তার মধ্য দিয়ে স্কুটারে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া—না সুজয় যেন ভাবতেই পারছে না।

গত বছর অলকের ছোটকাকা একটা স্কুটার কিনেছেন। অলকদের বাড়ির পেছনের মাঠে ছোটকাকার কাছে অলক শিখে ফেলেছে স্কুটার চালানো। তখুনি স্কুটার চালানো শিখেছে সুজয়। অলকের ছোটকাকাই শিখিয়েছেন।

ডাকবাংলোর সামনের ফাঁকা রাস্তায় তারপর কতবার যে স্কুটার চালিয়েছে সুজয় তার ঠিক নেই। স্কুটার অলকের ছোটকাকাই চালাতে দিয়েছেন। "স্কুটার চালানোটা তুই দিব্যি শিখে গেছিস সুজয়।" ছোটকাকা বলেন মাঝে-মাঝেই।

এখন স্কুটার চালাতে চাইলেই চালাতে দেন অলকের ছোটকাকা। বাবা একদিন সুজয়কে স্কুটার চালাতে দেখেছিলেন। কী যে অবাক হয়েছিলেন বাবা, তা বলতে পারবে না সুজয়। বাবার কাছে কথাটা শুনে মা তো ভয়েই বড়-বড় করেছিলেন চোখ। বলেছিলেন, "সত্যি, সুজয় যে কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে শেষ পর্যন্ত!"

বাবা সহজ গলায় বলেছিলেন, "সুজয় খুব ভাল স্কুটার চালায়। বড় হলে ওকে একটা স্কুটার কিনে দেব ভেবে ফেলেছি।"

মা সে কথার উত্তরে কিছু বলেননি সেদিন। কিন্তু সুজয় জানে, মা'র মন থেকে ভয়টুকু কিছুতেই যায়নি।

সুজয় মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, একদিন স্কুটার চালানো মাকে দেখিয়ে দেবে ঠিক। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই স্কুটারটার কাছে এল সুজয়। ভাবল প্রিয়তোষকাকাকে একবার স্কুটারটা চালিয়ে বেড়িয়ে আসবার কথাটা বললে কেমন হয়? মা এখানে থাকলে ঠিক বাধা দিতেন। বাবা নিশ্চয়ই বাধা দেবেন না। বরং হয়তো উৎসাহই দেবেন।

কথাটা ভেবেই সিঁড়ি বেয়ে চোখের পলকে ওপরে উঠে এল সুজয়। বাবা আর প্রিয়তোষকাকা দুজনেই ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন। রামবাহাদুর ট্রেতে চায়ের কাপ সাজিয়ে ঢুকল ঘরে। বোধহয় চা তৈরি হয়েছে বলে রামবাহাদুর ডেকে তুলে দিয়ে গেছে দু'জনকে।

সুজয় একবার বাবাকে দেখে নিয়ে প্রিয়তোষকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "নীচে যে স্কুটারটা দেখলাম, সেটা কি আপনার?"

প্রিয়তোষকাকা চায়ের কাপটা ট্রে থেকে হাতে তুলে নিয়ে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "স্কুটার চালাতে পারো নাকি?"

সুজয়ের 'হ্যাঁ' বলার আগেই বাবা বললেন, "ওর এক বন্ধুর ছোটকাকা স্কুটার কিনেছে, তার কাছেই লুকিয়ে শিখেছে স্কুটার চালানো। এখন বেশ ভাল চালায়।"

প্রিয়তোষকাকা খুশি হয়ে বললেন, "লুকিয়ে শেখার একটা মজা আছে। আর যারা লুকিয়ে শেখে, তারাই ভাল শেখে।"

সুজয় হাসল। কিছু বলল না। প্রিয়তোষকাকা এবার হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে স্কুটারের চাবিটা নিলেন। তারপর সুজয়ের হাতে চাবিটা দিয়ে হেসে বললেন, "নাও, ছুটে

নেমে গিয়ে স্টার্ট দাও স্কুটারে। আমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি। দেখব, তুমি কেমন স্কুটার চালাও।"

দারুণ একটা খুশিতে বড়-বড় করে নিশ্বাস নিতে থাকল সুজয়। চাবিটা একবার দেখল। বাবা আর প্রিয়তোষকাকার মুখ দেখল একবার। দু'জনেই হাসছেন।

স্কুটারটা নিয়ে ঠিক বেরিয়ে পড়বে সুজয়। দুধারের ঘন বনের ভেতর দিয়ে একা-একা স্কুটার চালিয়ে যাওয়ার আনন্দ বুঝি এখুনি অনুভব করতে পারছে সুজয়। এত সহজে যে স্কুটারটা পেয়ে যাবে, সেটা ভাবতেই পারেনি সুজয়। এখনও ভাবতে পারছে না। সেজন্যে বুঝি ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচে ছুটে যেতেও ভুলে গেছে সুজয়।

বাবা বললেন, "কী হল, চলে যাও। গিয়ে স্টার্ট দাও স্কুটারে।"

"যাচ্ছি।" বলে বড় করে আর একটা নিশ্বাস নিয়ে নীচে যাবার জন্যে ছুটতে শুরু করল সুজয়। এক নিশ্বাসেই ঘর পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্কুটারের সামনে এসে দাঁড়াল সুজয়। হাঁফাতে-হাঁফাতে একবার দেখল স্কুটারটাকে। তারপর স্টার্ট দিল। চারদিকের নির্জনতায় সে শব্দ বুঝি মস্ত বড় করে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই। স্কুটারটাকে ঘুরিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসে বারান্দার দিকে চোখ তুলল সুজয়। প্রিয়তোষকাকা আর বাবা রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুজয় তাকাতেই প্রিয়তোষকাকা বললেন, "নাও উঠে পড়ো এবার।"

সঙ্গে সঙ্গে স্কুটারে উঠে পড়ল সুজয়। তারপর একবার সামনের দিকে তাকিয়ে চালিয়ে দিল স্কুটার। থামল এসে গেটের সামনে।

"গুড! ভেরি গুড!" প্রিয়তোষকাকা বললেন চেঁচিয়ে। সুজয় ফিরে তাকাল প্রিয়তোষকাকার দিকে। তারপর স্কুটার থেকে নামবার জন্যে পা বাড়াল।

প্রিয়তোষকাকা ঠিক তেমনিভাবেই চেঁচিয়ে বললেন, "না না, তোমায় নামতে হবে না। সন্ধে পর্যন্ত স্কুটার তোমার।"

সন্ধে পর্যন্ত স্কুটার সুজয়ের! তার মানে সুজয়কে বিশ্বাস করে ফেলেছেন প্রিয়তোষকাকা। সন্ধে পর্যন্ত যেমন ইচ্ছে স্কুটার চালিয়ে বেড়াতে পারে সুজয়। সুজয়ের সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। বাবার দিকে এবার তাকাল সুজয়।

বাবা বুঝি বুঝতে পারলেন, তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছে সুজয়। আর সে-জন্যেই বুঝি হাত তুলে বললেন, "প্রিয়তোষকাকা যখন বলেছেন, তখন আর কী! স্কুটার নিয়ে ঘুরে এসো খানিকটা।"

চোখের পলকে বুঝি সুজয়ের পৃথিবীটাই পাল্টে গেল। সুজয় সামনের দিকে তাকাল। বিকেলের ছায়ায় চমৎকার হয়ে আছে চারদিক। রাস্তাটা যেন আরও অনেক বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। সন্ধে পর্যন্ত অনেকটাই বেড়িয়ে আসতে পারবে সুজয়। এ একেবারে একা-একা নিজের মতো করে বেড়ানো।

ডাকবাংলোর সামনের রাস্তায় যখন স্কুটার চেপেছে, তখন অলক আর অলকের ছোটকাকা তাকিয়ে থেকেছে। বেশি দূরও চালাতে পারেনি সুজয়। খানিকটা গিয়েই ঘুরে আসতে হয়েছে। এখন আর কিছু ভাবতেই হবে না। এসব ভাবতে ভাবতেই আর একবার বাবা আর প্রিয়তোষকাকাকে দেখে নিয়ে স্কুটারটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল সুজয়।

চারদিকে শুধু বড়-বড় গাছপালা আর ঝোপঝাড়। চোখ যায় না তার ভেতর। নেমে পড়ে ভেতরে ঢুকবার কথাটা তো ভাবাই যায় না। রাস্তাটা যেন কোনওরকমে তারই মধ্য দিয়ে একা-একা চলে গেছে। যেতে যেতেই খানিকটা দূরে লুকিয়ে পড়েছে জঙ্গলের মধ্যে। সুজয় আর কিছু বুঝি ভাবতে পারছে না। এক আকাশ খুশি নিয়ে ভাসতেই থাকল হাওয়ায়।

স্কুটারের শব্দের জন্যে বনের কোনও শব্দ কানে আসছে না সুজয়ের। হঠাৎ কী ভেবে দুটো রাস্তার মুখে এসে স্কুটার থামাল সুজয়। স্টার্ট বন্ধ করল তারপর। চারদিক মুহূর্তে কী যে নির্জন হয়ে গেল।

কেবল ঝিঁঝির একটানা ডাক ভেসে বেড়াতে থাকল চারদিকে। তারই সঙ্গে বিকেলের পাখির ডাক মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। সুজয়ের কী যে ভাল লাগছে, সুজয় তা বোঝাতে পারবে না।

অনেকটা পেছনে এখন প্রিয়তোষকাকার ফরেস্ট বাংলো। কাছাকাছি বাড়িঘর নেই। লোকজন নেই, কিচ্ছু নেই। বাবা আর প্রিয়তোষকাকা নিশ্চয়ই এখন সেই রেলিংয়ে ঝুঁকেই দাঁড়িয়ে আছেন। গল্প করছেন চা খেতে খেতে। সুজয়কে নিয়ে কি দুজন ভাবছেন? না, কখনওই ভাবছেন না। তাহলে বলেই দিতেন, দূরে যেও না। কাছাকাছিই থাকবে—। সন্ধে পর্যন্ত স্কুটারটা তোমার—মানে সন্ধে পর্যন্ত যেমন ইচ্ছে বেড়াতে পারে সুজয়।

মা যদি এখানে থাকতেন? স্কুটারের চাবিটাই তাহলে ধরতে দিতেন না মা। মা'র মুখটা একবার ভেবে ফের স্কুটারে স্টার্ট দিল সুজয়। ডান দিকের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। খানিকটা গিয়ে ঘুরে গেছে বাঁ দিকের রাস্তাটা। সুজয় সেদিকে স্কুটারের মুখ ঘোরাল।

বিকেল যত গড়াচ্ছে, ছায়া তত ঘন হচ্ছে। আরও গভীর মনে হচ্ছে বনকে। প্রিয়তোষকাকা বলেন, ডুয়ার্সের বন বড় ভয়ংকর।

সুজয়েরও মনে হচ্ছে তাই। এখানে রাত নামলে কী রকম অন্ধকার নেমে আসবে ভাবাই যাচ্ছে না। বিকেলের ছায়াতেই বনের ভেতরটা যেমন অন্ধকার অন্ধকার! কথাটা ভাবতে ভাবতেই বাঁক ঘুরল সুজয়। একটা ট্রাক আসছে। বোঝাই কাঠ ট্রাকটার ওপর। অসম্ভব শব্দ করে আস্তে আস্তে আসছে।

ছবির মতো লাগছে দেখতে। সুজয় খুব সাবধানে ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে এল। তারপর পেছন ফিরে মুহূর্তের জন্যে একবার চলে-যেতে-থাকা কাঠবোঝাই ট্রাকটাকে দেখে নিল।

আলো খুব তাড়াতাড়ি কমে আসছে। মনে হচ্ছে, অন্ধকার নামতে আর দেরি নেই। অন্ধকার নামুক, লাইট জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ফিরবে সুজয়। সুজয় তো তাই চায়। হেঁটে অবশ্য এমনিভাবে আসতে সাহস পেত না সুজয়। এমন একটা স্কুটার থাকলে ভয়ের কী আছে!

সুজয় আরও অনেক জোরে চালাতে থাকল।

ঝুপ করে বুঝি হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে পড়ল একসময়। ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না সুজয়। যেখানে যতটুকু আলো ছিল, কেউ যেন এক ফুঁয়ে তা উড়িয়ে দিয়েছে। কেবল জোনাকি জ্বলছে-নিবছে চারদিকে।

সত্যিই একটুও ভয় হচ্ছে না সুজয়ের। বরং ভাল লাগছে।

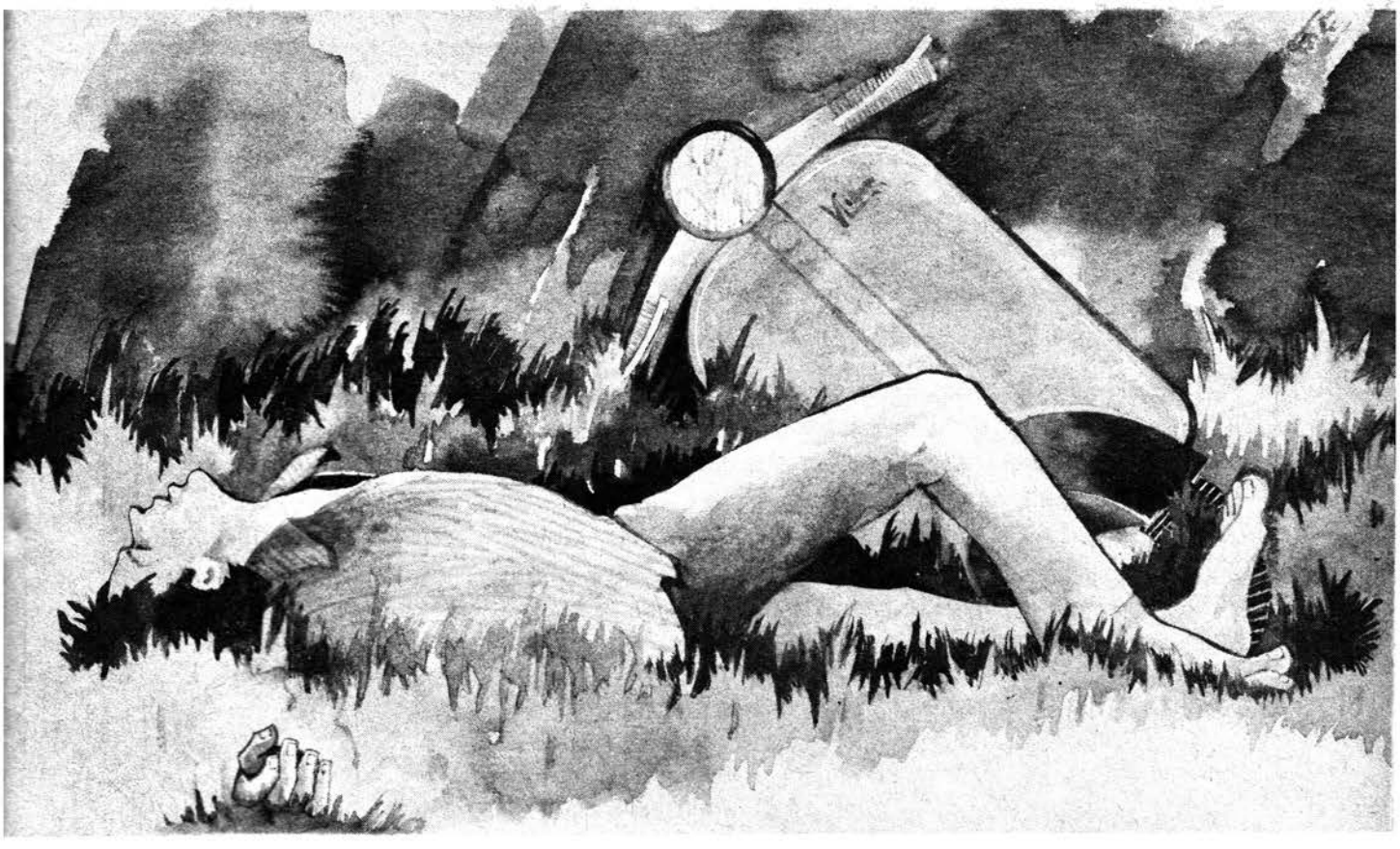

মাঝে-মাঝেই ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তা আলোয় ভরে দিয়ে যাচ্ছে তারা।

দূর থেকে দেখলে মনে হয়, মস্ত একটা আলো যেন রাস্তা আলোয় ভরে চলে যাচ্ছে। স্কুটারের লাইটটা জ্বেলে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজয়। বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। যেন একটা অন্ধকারের সুড়ঙ্গের ভেতর সুজয় আলো ফেলেছে।

এবার মনে হচ্ছে, অনেকটা পথ চলে এসেছে সুজয়। এদিকটায় রাস্তা তত ভাল নয়। ট্রাককে জায়গা দিতে রাস্তার পাশে দুবার নামতে হয়েছিল। কী লাফিয়ে উঠেছিল স্কুটারটা! প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সুজয়। কোনওরকমে সামলে নিয়েছে।

এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বেশি দেরি হলে প্রিয়তোষকাকা নিশ্চয়ই ভাববেন। বাবাও। সন্ধের মধ্যেই সুজয়ের ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই সুজয় ফিরতে পারছিল না। এমনিভাবে চলতে থাকা বুঝি একটা নেশা—সুজয়ের মনে হল। নেমে পড়ে স্কুটারটা ঘুরিয়ে নিল সুজয়। সুজয় যে এত দেরি করবে, নিশ্চয়ই দুজনের কেউই সেটা ভাবেননি। খানিকটা গিয়েই সুজয় ফিরে আসবে, এ-কথাই হয়তো ভেবেছিলেন দুজন।

সুজয় নিজেই কি ভেবেছিল, এমনভাবে এতটা চলে আসবে? সন্ধে পেরিয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে? ভাবতে ভাবতেই স্কুটারে উঠে সুজয় চালিয়ে দিল স্কুটার। স্কুটারের সামনের আলো পথের ওপর যেন স্কুটারটার সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে। দুপাশের জঙ্গলে যতটুকু জায়গায় সেই আলো পড়ছে, ততটুকু জায়গাই যেন নড়ছে আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

সবকিছু অন্যরকম লাগছে সুজয়ের। একটা গল্পের মতো বেড়ানো হল। মনে মনে ভাবল সুজয়। অলককে বললে অলক হিংসে করবে ঠিক। অলকেরও খুব সাহস আছে। এমনভাবে আসতে ওরও এতটুকু ভয় হত না।

মা যখন শুনবেন এমন একটা কাণ্ড করেছে সুজয়, তখন সত্যিই দারুণ রাগ করবেন। হাওয়ায় এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। লাগুক, সুজয় এখন ঠাণ্ডাকে গায়ে লাগাচ্ছে না।

একটু জোরেই স্কুটারটা চালাচ্ছিল সুজয়। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল একটা ট্রাকের হেডলাইটে। বাঁকের মুখে আলো দেখতে পেয়েছিল সুজয়। কিন্তু সে এমন চোখ-ধাঁধানো ছিল না। অন্ধকারের জন্যেই বুঝি আরও তীব্র মনে হচ্ছে হেডলাইট দুটোকে।

খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে স্কুটারটাকে থামাতে থামাতেই আলোটা যেন চোখের সামনে এসে লাফিয়ে পড়ল। মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে সুজয় পাশে নামিয়ে দিল স্কুটার। বোধহয় গর্ত ছিল পাশে। তাতেই সামনের চাকা পড়ে পলকে লাফিয়ে উঠল স্কুটার। দুহাতে আর হ্যাণ্ডেলটাকে ঠিকমতো ধরে রাখতে পারল না সুজয়। রাস্তার ঢালু বেয়ে আরও একশোগুণ বেগে বুঝি স্কুটারটা গড়িয়ে এল। সামনে একটা গাছ—সেই গাছের গায়ে যেন আছড়ে পড়ল স্কুটারটা।

সুজয়কে কেউ যেন ছুঁড়ে দিল শূন্যে। দু-হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চাইল সুজয়, পারল না।

কোথায় যে নেমে এল সুজয়, তা-ও বুঝতে পারল না। ভয়ংকর কষ্টের একটা স্বপ্নের মতো কয়েকটা মুহূর্ত পলকে

সত্যজিৎ রায়ের দু-দুটি নতুন বই

এবারের ১ বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছে

সত্যজিৎ রায়ের আপাদমস্তক হাসির বই

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

দাম ১০·০০

প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প। গল্প তো নয়, টসটসে আঙুরের থোকা। সংহত, নিটোল, রসে ভরপুর। জিভে ছোঁয়ালেই হাসি।

পরমান্ন যেমন মিষ্টি ছাড়া হয় না, রসগোল্লা যেমন বিনারসে তৈরি হওয়া অসম্ভব, মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্পের সঙ্গে তেমনি মিশে থাকে অনিবার্য কৌতুক। অনেকে বলেন এ-সব গল্পের জন্ম তুরস্কে। সেখানে প্রতিবার মোল্লার জন্মদিন পালিত হয়। কিন্তু জন্ম যেখানেই হোক, মোল্লা নাসীরুদ্দীন আজ দেশ কালের সীমানা ছাড়ানো এক বিরলবিচিত্র বিশ্বব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর যে-প্রান্তেই রসিক মানুষ, সেখানেই তাঁর গল্প। মোল্লা নাসীরুদ্দীনের সেই কালজয়ী গল্পেরই নির্বাচিত এক সংগ্রহ এই বইতে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। পাতায় পাতায় নতুন আঁকা মজার ছবি, চোখ-ভোলানো প্রচ্ছদপট। সত্যজিৎ রায়ের তুলিতে।

বইমেলায় বেরিয়েছে

সত্যজিৎ রায়ের

এক মলাটে দু-দুটি রহস্য-অ্যাডভেনচার

ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু

দাম ১২·০০

এক মলাটে দু-দুটি পুরো মাপের রহস্য-উপন্যাস। তার মানে দ্বিগুণ চমক, দ্বিগুণ মজা। তার থেকেও বড় কথা, দু-ক্ষেত্রেই রহস্যভেদীর নাম গোয়েন্দা ফেলুদা—বাংলা সাহিত্যে যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ুর ভাষায়—এ· বি· সি· ডি।

হ্যাঁ, এ· বি· সি· ডি। মানে, 'এশিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর'। জটায়ু যে ফেলুদাকে এই দুর্দান্ত অনারারি টাইটল দিয়েছিলেন, সেটা বোধহয় অনেকেই জানেন না। এও জানেন না যে, অন্যসব ব্যাপারে যত বাড়াবাড়িই থাক, এক্ষেত্রে জটায়ু যাকে বলে একেবারে যথাযথ। একটা হারানো চন্দনা খুঁজে দিতে গিয়ে নেপোলিয়নের স্বহস্তে লেখা দুর্লভ চিঠি যেভাবে উদ্ধার করলেন ফেলুদা, আর সেইসঙ্গে এক খুনের কিনারা—তা সত্যিই অকল্পনীয়। আর সেই কাহিনীই এ-বইয়ের প্রথম উপন্যাস।

দ্বিতীয় উপন্যাসটিও কম উত্তেজনাকর নয়। তিরিশ বছর আগের এক ঘটনার সূত্র ধরে নতুন করে জট পাকানো রহস্যের চমক-জাগানো সমাধান। আর এবার কাণ্ড কেদারনাথে। সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ ও পাতা জোড়া জোড়া অলঙ্করণ।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

ফুরিয়ে গেল। অনেক দূর থেকে আসা শব্দের মতো স্কুটারের ইঞ্জিনটার অদ্ভুত একটা শব্দ শুধু শুনতে পেল কিছু সময়। তারপর আর কিছুই শুনল না।

ঝিঁঝির তীব্র ডাকে হঠাৎ একসময় আচ্ছন্নের মতো চোখ মেলল সুজয়। চোখ মেলেই টের পেল অন্ধকারে একটা ঝোপের মধ্যে ডুবে আছে সে। লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করল সুজয়। পারল না। বাঁ পা-টা বুঝি নাড়ানো যাচ্ছে না। ওঠার জন্য ভর দিতে গিয়ে বাঁ-হাতটাতেও যন্ত্রণা শুরু হল। কোমরের কাছটাতেও অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

অসম্ভব শীতে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপছে। সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল মুহূর্তে। তার মানে স্কুটার থেকে ছিটকে এই ঝোপের মধ্যে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সুজয়।

আতঙ্কে তার নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে এল। নিশ্চয়ই এখানে এই ঝোপের মধ্যে একটু-একটু করে মরে যাবে সে। ঠিক মরে যাবে।

আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়ে একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

অন্ধকার আর অন্ধকার চারদিকে। হাত বাড়িয়ে ঝোপের একটা ডাল মুঠো করে ধরল সুজয়। চোখ বুজল একটু সময়ের জন্যে। মা'র মুখ ভেসে এল মনে। মনে ভেসে এল বাবার মুখ। না, সুজয় মরে যেতেই পারে না। হঠাৎ দারুণ একটা উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকল সে। ঘেমে গেল সমস্ত শরীর। সে উঠে পড়বেই। হাতে ভর দিয়ে সুজয় কোনওরকমে উঠে বসল। অন্ধকার একটা ঝোপের মধ্যে সে ডুবে আছে। স্কুটার থেকে ছিটকে তাহলে এই ঝোপের মধ্যে পড়েছিল সে! উত্তেজনায় আরও কিছুটা সময় হাঁপাল সুজয়। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের বাইরে আসতে থাকল।

বেরিয়ে আসতে গিয়ে সারা শরীর ছড়ে গেল সুজয়ের। ছিঁড়ে গেল জামা।

কিছুতেই তবু থামল না সে। না, সুজয় কিছুতেই পড়ে থাকতে পারে না এখানে। কান্নাটাকে কোনওরকমে চাপতে গিয়ে সুজয়ের সারা শরীর কাঁপছে। ঝোপের বাইরে এসে চারদিকে তাকাল সে।

ভয়ংকর একটা রাত্রি যেন চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। সেই কখন সামনে দুটো তীব্র আলো ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সব কিছু। তারপর সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল—ছায়ার মতো এখন মনে পড়ছে সব।

এখন রাত কত কে জানে! একটু-একটু করে পাশের একটা গাছ ধরে উঠে দাঁড়াল সুজয়। এবার যেন খানিকটা বিশ্বাস ফিরে আসছে নিজের ওপর। ঝিঁঝির একটানা তীব্র ডাক শুনতে পেল, শুনতে পেল আরও নানান শব্দ।

চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না এখন। স্কুটারটাকে খুঁজেও লাভ নেই। বরং কোনওরকমে যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে সুজয় একটা ট্রাক পেয়ে যেতে পারে! কথাটা মনে হতেই অসহায় উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল সুজয়। পা বাড়াল রাস্তার দিকে। টলে পড়ছে শরীর। তবু কোনওরকমে গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই উঠে এল রাস্তায়। পথ ভরে জোনাকিরা জ্বলছে-নিবছে। যেন কোনওদিন এ-পথে কেউ যায়নি, কিছু

যায়নি। যাবেও না। সুজয় এখন কী করবে? হঠাৎ এখানে তাকে দেখলে যে ট্রাকই যাক, ঠিক দাঁড়াবে। তুলেও নেবে।

কিন্তু এত রাতে কি ট্রাক যাওয়া-আসা করে? যদি সারারাত এখানে এমনিভাবে থাকতে হয়, সুজয় তাহলে ঠিক মরে যাবে। ফের ভয়ংকর একটা আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকল সুজয়ের। সুজয় ফুঁপিয়ে উঠল।

কেউ জানতে পারছে না, সুজয় এখানে একটু-একটু করে মরে যাচ্ছে। সে দু'হাতে মুখ চেপে থরথর করে কাঁপতে থাকল। কতটা সময় এমনভাবে ফুরল, সুজয় তা জানে না। হঠাৎ মনে হল, দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। লাফিয়ে উঠল সুজয়। হ্যাঁ, একটা ট্রাকের শব্দ। মুখ থেকে হাত সরাল সুজয়। আশ্চর্য একটা শক্তিতে উঠে দাঁড়াল। হাঁপাতে থাকল উত্তেজনায়।

আলোর একটা আভাস বুঝি দূরে। যে করেই হোক, ট্রাকটা থামাতেই হবে। যে করেই হোক উঠে পড়তে হবে সেই ট্রাকে। এমনভাবে তাকে দেখলে কেউ তুলে না নিয়ে পারবে না। কোনওরকমে একটু-একটু করে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল সুজয়। ট্রাকের আলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসম্ভব দ্রুত ছুটে আসছে ট্রাকটা। ট্রাকের শব্দ এবার ভরে দিচ্ছে চারদিক।

সুজয় উত্তেজনায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হাঁটুর ওপর দু-হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল সুজয়। ট্রাকের আলোয় এবার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সুজয়ের। তবু সেই আলোর দিকে তাকিয়েই রইল। আলোয় যে এত আনন্দ সুজয় বুঝি তা এতদিন জানত না।

কখন যে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাকটা, আবেগে, আনন্দে উত্তেজনায় সুজয় যেন তা বুঝতেই পারল না। খানিকটা আচ্ছন্নের মতো সুজয় দেখল একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন ট্রাক থেকে। আরও কয়েকজন নেমে এল ট্রাক থেকে। সুজয়ের সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে সুজয়কে বুঝি একবার ভাল করে দেখলেন ভদ্রলোক। কথা বলতে গিয়েও সুজয় কথা বলতে পারছে না।

কান্নায় থরথর করে কাঁপছে সুজয়ের সারা শরীর। পা-দুটো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছে না সুজয়। ভদ্রলোক হঠাৎ দু-হাতে ধরলেন তাকে। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন সুজয়কে না ধরলে পড়ে যাবে সুজয়। তারপর খানিকটা উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কোত্থেকে এলে বলো তো?"

বলার চেষ্টা করল সুজয়, কিন্তু বলতে পারল না। ঠোঁটদুটো শুধু কাঁপতে থাকল। ভদ্রলোক ফের বললেন, "কী হয়েছে, বলে ফেলো তো একবার।"

সুজয় চোখ বুজল। চুপ করে থাকল খানিকটা সময়। তারপর অস্পষ্ট গলায় একটু একটু করে পুরো ঘটনাটা বলে ফুঁপিয়ে উঠল।

ভদ্রলোক কী যেন ভাবলেন। পাশের লোকজনকে কী যেন বললেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। ভদ্রলোক এবার ভাল করে বুঝি দেখলেন সুজয়কে। বললেন, "চলো, আগে উঠে পড়ি গাড়িতে। তারপর দেখছি কী করা যায়!" বলেই দু-হাতে সুজয়কে তুলে ট্রাকের সামনের সিটে বসিয়ে দিলেন।

সুজয়ের আর কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। কোথায় যে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন তাকে, তাও জিজ্ঞেস করতে পারল না সুজয়। ট্রাকের সামনের সিটে বসে ইঞ্জিনের গরমে সমস্ত শরীর এবার আরও শিথিল হয়ে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। চোখ বুজল সুজয়।

ভদ্রলোকের কথা শুনে যারা জঙ্গলে নেমে পড়েছিল, বোধহয় তারা স্কুটারটাকে পেয়েছে। তুলে এনে ট্রাকে তুলছে এখন। অস্পষ্টভাবে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল সুজয়। সুজয়ের নিজের বুঝি আর একটা কথা বলারও শক্তি নেই। বড়-বড় করে নিশ্বাস নিতে থাকল সুজয়। গাড়ি চলতে শুরু করল। ভদ্রলোক আস্তে করে সুজয়ের গায়ে হাত রাখলেন। কিছু বললেন আস্তে আস্তে। কিছু শুনল না সুজয়। শোনার মতো ক্ষমতাই বুঝি নেই। মুহূর্তের জন্যে একবার চোখ মেলল শুধু। তারপর আচ্ছন্নের মতো ঘুমের গভীরে যেন তলিয়ে গেল একটু-একটু করে।

হঠাৎই যেন ঘুমটা ভেঙে গেল সুজয়ের। ঠিক হঠাৎ নয়, একটা কষ্টের স্বপ্ন বুঝি দেখতে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু এ-কোথায় শুয়ে আছে সুজয়? সে লাফিয়ে উঠে বসল। লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়েই সে টের পেল, তার সারা শরীর জুড়ে ব্যথা। ভয়ংকর একটা স্বপ্নের মতো গতকালের সন্ধেটা লাফিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

সুজয় বড়-বড় করে নিশ্বাস নিতে থাকল। ভাগ্যে সেই ভদ্রলোক তাকে তুলে এনেছিলেন! না হলে এতক্ষণ সেই জঙ্গলের মধ্যে—

না, সুজয় আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না! ডান হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হ্যাঁ, মনে পড়ছে সুজয়ের। ডাক্তার এসেছিলেন সেই রাত্রে। একটা ওষুধও বুঝি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে খেয়েছিল সুজয়!

ঘরের ভেতরের অস্পষ্ট অন্ধকারে সুজয় খাট থেকে আস্তে আস্তে নীচে নামল। না, তখনকার সেই কষ্ট আর নেই। ওষুধ খেয়ে আর ঘুমিয়ে এখন শরীর বুঝি ঠিক হয়ে গেছে অনেকটা। সারা শরীর জুড়ে শুধু ব্যথাটাই আছে এখন।

দু'পা হেঁটে সুজয় দেখে নিল। ঠিক-ঠিক হাঁটতে পারছে কি না। উত্তেজনায় সুজয় এবার হাঁফাতে থাকল। বাইরে পাখি ডাকছে। তার মানে সকাল। কাল সেই শেষ দুপুরে স্কুটার নিয়ে বেরিয়েছিল সুজয়। সন্ধের মধ্যেই কথা ছিল ফেরার। সন্ধে পেরিয়ে, রাত পেরিয়ে এখন সকাল—

সুজয় অসহায়ভাবে বাবা আর প্রিয়তোষকাকার মুখ ভাবল। এখন দু'জন কী করছেন? স্কুটার নিয়ে সুজয় কোথায় গেছে, সে-কথা কিছুতেই তো ভেবে উঠতে পারবেন না তাঁরা। ট্রাকের লোকজন স্কুটারটাও তুলে এনেছে। স্কুটারটা যদি ওখানে থাকত, তাহলে কিছু-একটা ভেবে ফেলতে পারতেন দু'জন। হাজার খুঁজেও এখন সুজয়ের কোনও চিহ্নই পাবেন না তাঁরা।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল সুজয়। এক্ষুনি যদি সুজয় বেরিয়ে পড়ে? হ্যাঁ, সুজয় এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে। একা-একাই বেরিয়ে পড়বে। কাউকে জানাবেও না সুজয়। যদি ভদ্রলোক এখনই যেতে না দেন? যদি বলেন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে যেতে দেব না। রাতে ডাক্তার তাকে দেখে কী বলেছেন, তা তো আর জানে না সুজয়!

সুজয় এখন বেশ ভাল আছে। ঠিক চলে যেতে পারবে সুজয়। শরীরের ব্যথা বাধা হবে না। বড় রাস্তায় গেলে ঠিক একটা ট্রাক পেয়ে যাবে সুজয়। সকাল থেকেই কাঠ আনবার জন্যে জঙ্গলের দিকে ছুটতে থাকে ট্রাকগুলো, সুজয় তা দেখেছে গতকালই। এ-রকম ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা দেখলে যে-কেউ তুলে নেবে। তাছাড়া প্রিয়তোষকাকার নাম বললে যে-কেউ তুলে নেবেই।

এভাবে যাওয়াটা খুব অন্যায় হবে ঠিক, কিন্তু না গিয়ে সুজয় পারবেই না। পরে বাবার সঙ্গে এসে ঠিক অন্যায়টা স্বীকার করে যাবে সুজয়। ঘর থেকে বেরোবার আগে বাইরেটা একবার দেখা দরকার।

পায়ে-পায়ে জানালার কাছে এল সুজয়। স্কুটার থেকে ছিটকে ভাগ্যে ঝোপটার ওপর পড়েছিল সুজয়। অন্য শক্ত জায়গায় পড়লে হাত-পা ভেঙে যেতে পারত। মরেও যেতে পারত। আসলে ভয়ে আর ঠাণ্ডায় কাল আরও বেশি কষ্ট হচ্ছিল শরীরে। সত্যিই যদি এই ট্রাকটা না পেত?

ভদ্রলোক যদি তাকে এমনভাবে তুলে নিয়ে না আসতেন? কিন্তু এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তেই হবে সুজয়কে। এক্ষুনি। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই হাত বাড়িয়ে সাবধানে জানালাটা খুলল সুজয়। বাইরেটা কুয়াশায় ঢেকে আছে। কিন্তু তার মধ্যেই জানালার কাছটাতে স্কুটারটাকে দেখল।

বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল মুহূর্তে। স্কুটারের সামনের দিকটা খানিকটা বেঁকে গেছে। আলোটাও ভেঙে তুবড়ে গেছে। সামনের চাকাটা ঠিক আছে।

তার মানে আচমকা ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল সুজয়।

ছিটকে পড়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। স্কুটারটাও অমনিভাবে ভেঙে গেছে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। তারপর আপনি একসময় বন্ধ হয়ে গেছে স্টার্ট। আবার স্টার্ট দিলে হয়তো ঠিক-ঠিক স্টার্ট হবে। কিন্তু সুজয় কি এখন স্কুটারটা চালাতে পারবে ? পারতেই হবে।

বাবার কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতেই হবে সুজয়কে। রাস্তার ট্রাকের জন্যে আর অপেক্ষা করবে না সুজয়। না, সে আর সময় নষ্ট করতে পারছে না। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এল সে। দরজা খুলল। তারপর এক নিশ্বাসে প্রায় ছুটেই এল জানালার পাশে স্কুটারের কাছে।

চাবিটা লাগানোই আছে স্কুটারে। এখনই স্কুটার নিয়ে ছুটবে সুজয়। যত তাড়াতাড়ি বাবার কাছে পৌঁছনো যায়, তত তাড়াতাড়ি বাবার কাছে পৌঁছবে।

সুজয়ের সারা শরীর টান-টান হয়ে উঠেছে, কষ্ট-টষ্ট সব ভুলে গেছে সুজয়। তাড়াতাড়ি সতর্ক চোখে চারদিক একবার দেখল সুজয়। মস্ত বাড়ি। ট্রাকটা ওদিকে কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে আছে। কাঠ এখনও নামানো হয়নি।

সুজয় যে ঘরটায় শুয়েছিল, সেটা বাইরের দিককার একটা ঘর। বোধহয় বাইরের লোকজন এ-ঘরে থাকে।

না, আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। শীতের দিনে এমন কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার-অন্ধকার সকালে কেউ কি ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসে ?

এই সুযোগেই বেরিয়ে পড়তে হবে সুজয়কে। দু-হাতে হ্যাণ্ডেলটাকে ধরে স্কুটারটাকে স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল সুজয়। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে। আর একবার চারদিক দেখে নিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে স্কুটারটাকে রাস্তার ওপর নিয়ে এল সুজয়। মনে হচ্ছে, স্কুটারটা ঠিকই আছে।

বেশ পরিশ্রম হয়েছে স্কুটারটাকে এতটুকু আনতেই। দাঁড়িয়ে একটু সময় হাঁফাল সুজয়। পিছন ফিরল। কুয়াশায় বাড়িঘর ডুবে আছে। কিচ্ছু আর যেন নেই কোনওদিকে।

স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল সুজয়। একবার, দুবার, তিনবার — না, স্টার্ট নিচ্ছে না। কপালে ঘাম জমে উঠল। অবশ হয়ে এল পা। কান্নায় ফের গলাটা বুজে এল। কী হবে এবার ?

ফের কোনওরকমে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল সুজয়। না, স্টার্ট নিচ্ছেই না। কান্না পাচ্ছে সুজয়ের। অবশ পায়ে তবু স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে করতে ঝুঁকে পড়ল সিটের ওপর ! পেছন থেকে কেউ পিঠে হাত রাখল ঠিক সেই মুহূর্তেই। চমকে ফিরে তাকাল সুজয়।

সেই ভদ্রলোক তার পিঠে হাত রেখেছেন। ছুটে এসে দারুণভাবে হাঁফাচ্ছেন তিনি। সুজয় পাথরের মতো হয়ে গেল। চতুর্দিকের কুয়াশার মধ্যে সব কিছু যেন ফের স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গেল। ভদ্রলোক এবার খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, "হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি তুমি নেই। স্কুটারও নেই বাইরে। তক্ষুনি বুঝে ফেলেছি, তুমি আমার চোখ এড়িয়ে পালাচ্ছ।"

সুজয় কিছু বলতে পারছে না। কী করে বলবে ? বাবার জন্যেই যে এমনিভাবে বেরিয়ে এসেছে সে, তা কী করে বোঝাবে ?

ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন। তারপর বললেন, "দাঁড়াও, দেখছি স্কুটারটাতে কেন স্টার্ট হচ্ছে না," বলেই ঝুঁকে পড়ে স্কুটারের দিকে ভদ্রলোক মন দিলেন।

খানিকটা সরে দাঁড়াল সুজয়। সে জানে না এবার কী হবে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক স্কুটারের কিছু কাজ জানেন। কিন্তু স্কুটার সারিয়ে কী একা ছেড়ে দেবেন সুজয়কে ?

প্রথমবারেই যদি স্টার্ট নিত স্কুটারটা, এতক্ষণে অনেকটা চলে যেতে পারত সুজয়। ভদ্রলোক কিছুতেই আর ধরতে পারতেন না তাকে। একবার স্কুটারে উঠলে সুজয়কে আর ধরতে পারত কেউ ! এসব কথা ভাবতে ভাবতে বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে ! হঠাৎ স্কুটারের স্টার্টে চমকে উঠল। ফিরে তাকিয়েই দেখল, ভদ্রলোক হাসছেন। সুজয়ও অসহায়ভাবে হাসল।

ভদ্রলোক বললেন, "ধাক্কা লেগে একটুখানি গোলমাল হয়েছিল। ঠিক করে ফেলেছি। স্কুটারের কাজ আমার জানা।"

অস্পষ্ট গলায় সুজয় বলল, "ও !"

ভদ্রলোক এবার উঠে পড়লেন স্কুটারে। তারপর হাত বাড়িয়ে সুজয়ের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, "নাও, পেছনে বসে পড়ো। আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। এক্ষুনি তোমার বাবার কাছে পৌঁছনো উচিত। শুধু বলে ফেলো, কোথায় যেতে হবে তোমার বাবার কাছে পৌঁছনোর জন্যে।"

কান্নায় সুজয়ের সমস্ত শরীর কাঁপছে।

কোনওরকমে প্রিয়তোষকাকার কথাটা বলে ফেলল সুজয়। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন বুঝি। বললেন, "ও। ওখানে যাবে। আর ভাবতে হবে না তোমায়। নাও উঠে পড়ো।"

এমনভাবে ভদ্রলোক বাবার কাছে পৌঁছে দেবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সুজয়।

"কী হল, উঠে পড়ো," তাড়া দিলেন ভদ্রলোক।

কোনওরকমে এগিয়ে এসে স্কুটারে উঠে পড়ল সুজয়।

"দেখবে, কত তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব," বলে স্কুটারটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

সুজয় সামনে তাকাল। কুয়াশায় ঢাকা বন। পথও ডুবে আছে কুয়াশায়। এই কুয়াশায় ডুবে-থাকা পথ ধরেই বাবার কাছে পৌঁছবে সুজয়। অধৈর্য উত্তেজনায় মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সুজয়।

তার সারা শরীর এখন গভীর একটা কান্নায় থরথর করে কাঁপছে।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

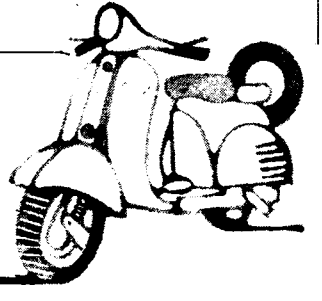

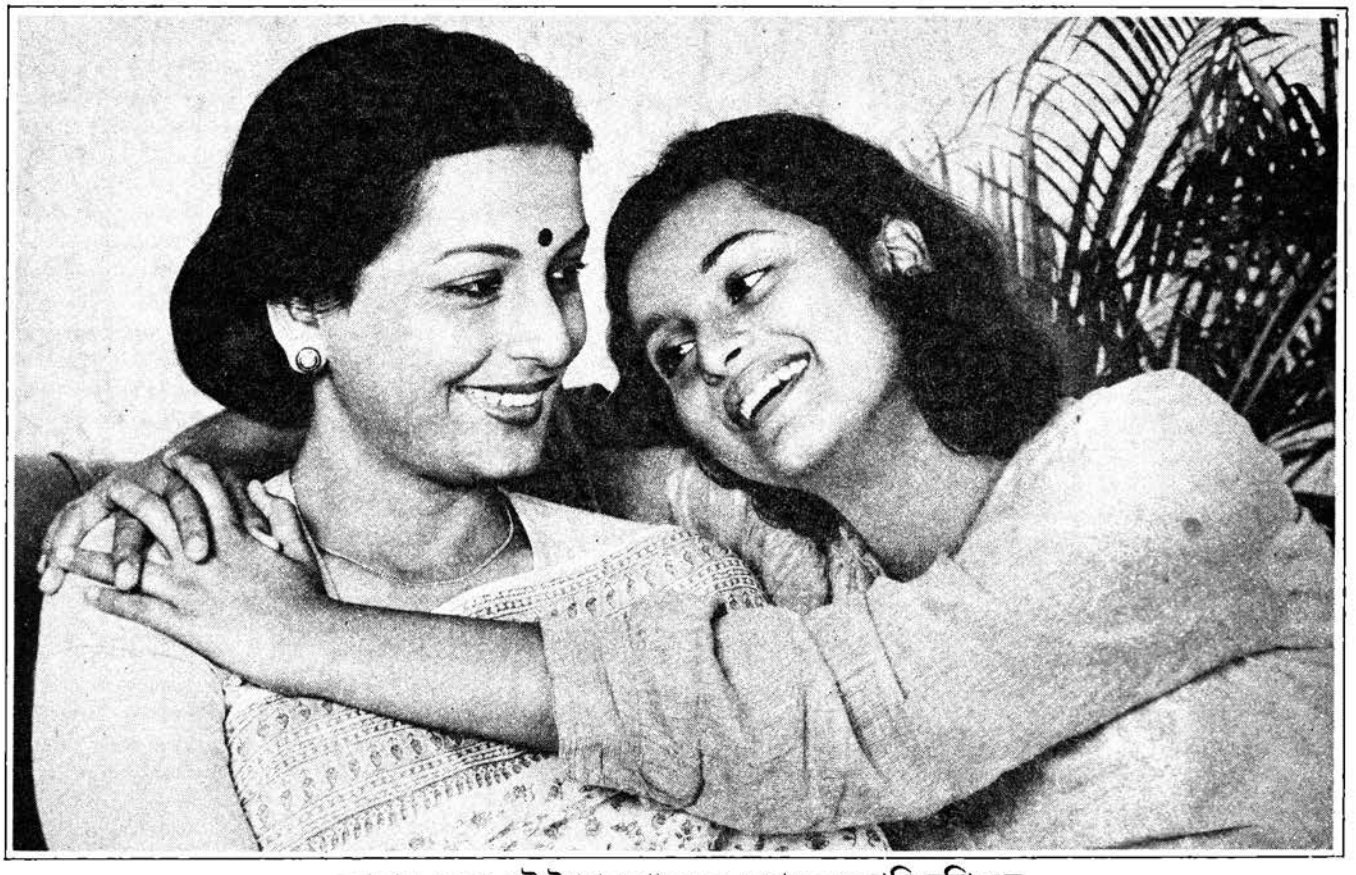

আমার মেয়ে এই শৈশব পার হল । মা হয়ে আমি বুঝি ওর পক্ষে এই সময়টা কত অস্বস্তিকর হতে পারে ।

"আমার মেয়ের জন্য কেন কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম"

মা মাত্রেই জানেন, মেয়েদের সেই বয়সটা কীভাবে কাটে—যখন শৈশব ছাড়িয়ে সবে কৈশোরে পা দিচ্ছে । সেই অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার দিনগুলি ।

মা হয়ে আমি মেয়ের অবস্থা ভালভাবেই বুঝি । আমিও তো একদিন ওই বয়সেরই ছিলাম ! আমি তো জানি মাসের ওই ক'টা দিন কত অসুবিধা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—কিন্তু তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—তবে তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

তাতে আব্রু বলতে কিছু থাকে না । যেমন তাতে অসুবিধা, তেমনি অস্বস্তি । আর তাতে পুরোপুরি

নির্ভরতা তো পাওয়াই যায় না—তার উপর আবার কখন কী ঘটে যাবে, সবসময় সেই ভয়।

অবশ্য এখন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই অভ্যস্ত। তা ছাড়া, আমাদের সময়ে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ ছিল না—কারণ ওই ক'টা দিন বাইরে বেরুনো ছিল একদম মানা।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো !...এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো ! কেয়ারফ্রীর সুরক্ষা যখন হাতের কাছেই মজুত, তখন আমার মেয়ে কেন আমার মতোই বোঝা বইবে ? ওর যুগ এখন আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও হরেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আমার মেয়ের কথাই ধরুন না—আমার সে-বয়সের তুলনায় ওকে সামাল দিতে হয় ঢের বেশি—যেমন পড়াশোনায়, তেমনি অন্য ব্যাপারেও। সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই যে, ও আমাদের মতো ঘরে বসে না-থেকে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করুক।

এই কারণেই তো আমি আমার মেয়ের জন্য কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম। যাতে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে—যা-ই করুক না কেন। আর এ-বিষয়ে কেয়ারফ্রীর আশ্বাস আর কেই বা দিতে পারে।

জানেন নিশ্চয়, কেয়ারফ্রী হল রেডিমেড ন্যাপকিন—যার ফলে এটা ব্যবহার করা আর বদলানো খুবই সহজ। মা হিসাবে আমার কাছে আরও বড় কথা এই যে, কেয়ারফ্রী হল পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত।

কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে আমার মেয়ে যাবতীয় বিড়ম্বনা অসুবিধা আর অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পায়। যখন দরকার, তখনই নিয়ে নেয় একটা আনকোরা নতুন ন্যাপকিন।

সত্যি কথা বলতে কী, এই রেডিমেড ন্যাপকিন কতটা কাজের হবে, সে-বিষয়ে আমার নিজেরই কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু আমার মেয়ে তো বেশ কিছুদিন হল এটা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করছে। সে বলে যে, কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে সে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ বোধ করে—এমনকি বাড়ির বাইরেও। কাজেই ওকে নিয়ে এ-ব্যাপারে অন্তত আমার আর কোনও ভাবনা নেই।

কেয়ারফ্রীর সুবিধা আমার মেয়ের জীবনকে এখন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে।

আমি এখন সত্যি নিশ্চিন্ত আর সুখী। আমি এতেই খুশি যে, আমার মেয়েকে এমন-কিছু দিতে পেরেছি, যা আমরা নিজেরা ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি—কেয়ারফ্রীর সুবিধা, কেয়ারফ্রীর স্বাচ্ছন্দ্য। আসলে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই তো প্রগতি, তাই না ?

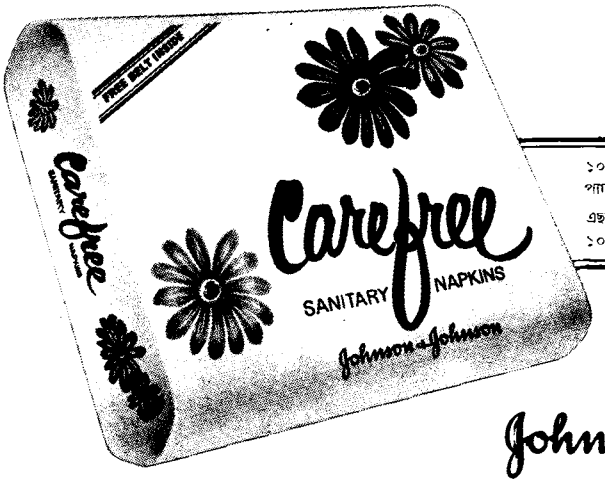

১০টি প্যাকে ও সাশ্রয়কারী ২০টির এবং ৩০টির প্যাকে পাওয়া যায়

এছাড়াও পাবেন, কেয়ারফ্রী এক্সট্রা লঙ্গ এর ১০টির প্যাক

কেয়ারফ্রী স্যানিটারি ন্যাপকিন—
পরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা

Johnson & Johnson

OBM/5070/BEN/AM

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

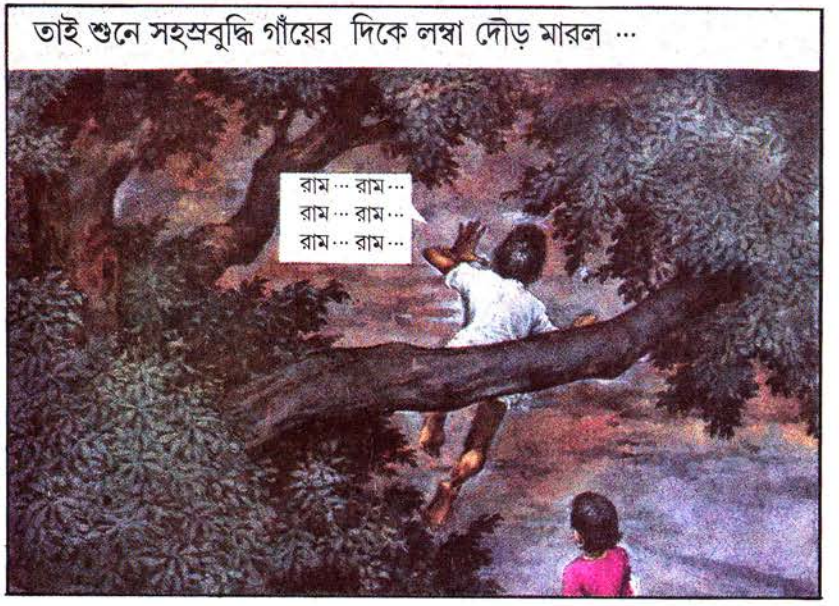

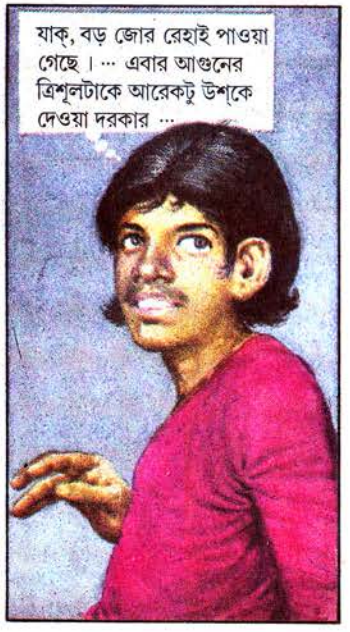

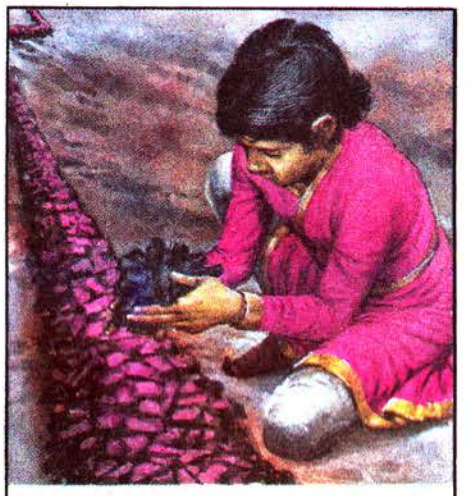

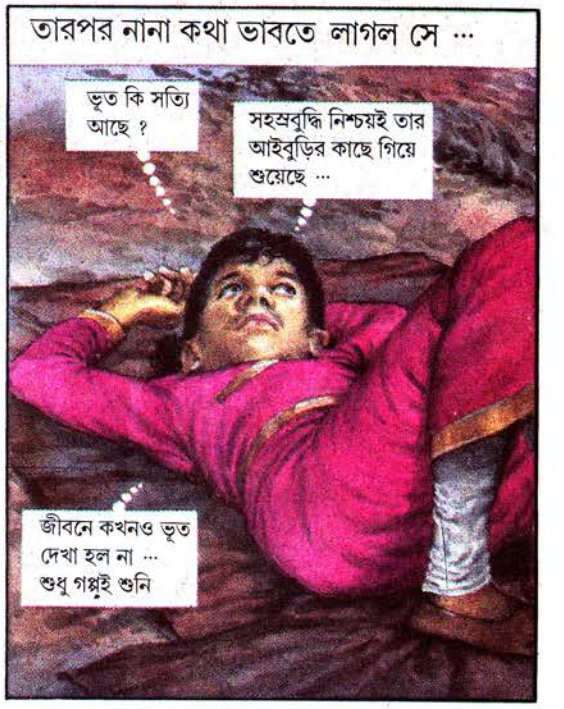

ছবি এঁকেছে **রেশমি নান** (বয়স ৭)

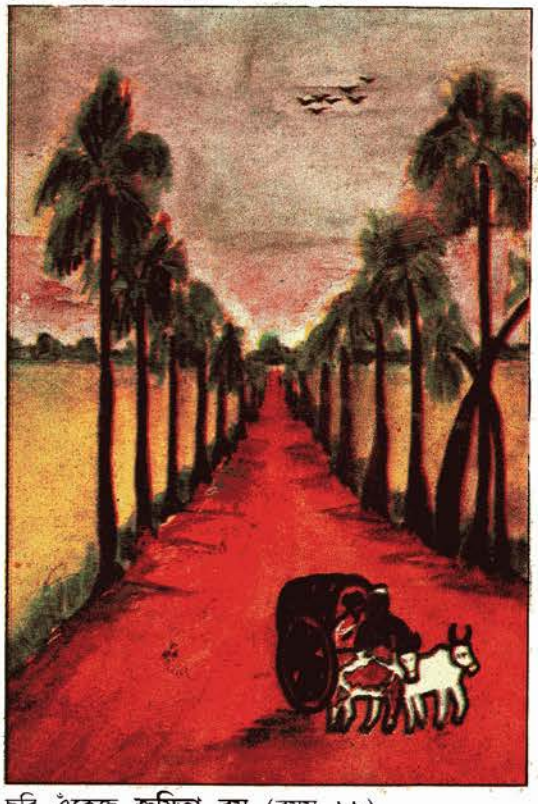

ছবি এঁকেছে **জয়িতা বসু** (বয়স ১১)

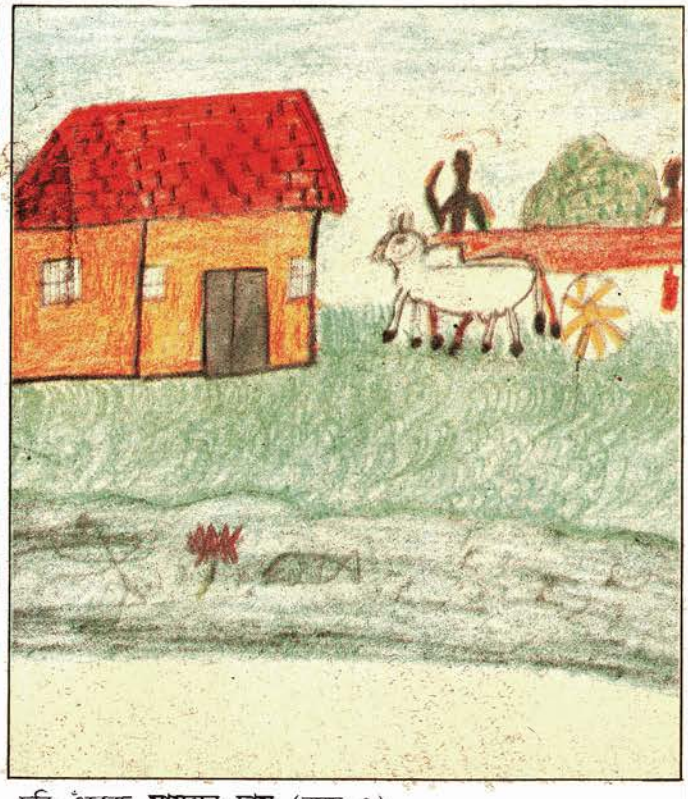

ছবি এঁকেছে **সায়ন্তন দাস** (বয়স ৭)

আড়ি নাকি !

ফুলপরি ও ফুলপরি
কোথায় যাও, কোন্ বাড়ি ?
আমার সাথে আড়ি নাকি !
খেলবে না আর রান্নাবাটি ?

সঙ্গীতা ভট্টাচার্য (বয়স ৭)

অপুর পথে

অনেকদিন ধরে আমার বিভূতিভূষণের বাড়ি দেখার ইচ্ছে ছিল। সেই সুযোগ এল শেষে। স্কুলের ছুটিতে আমরা দিদির বাড়ি রাখা মাইন্সে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমরা সকলে বাসে ঘাটশিলা গেলাম।

পাহাড়ি এলাকা। কী সুন্দর লাগছিল ! বাস থেকে নেমে স্টেশন পেছনে রেখে বেশ কয়েক মিনিট হাঁটার পরে আমরা বিভূতিবাবুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম। তাঁর বাড়ির সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি একটা সুন্দর শ্বেতপাথরের মূর্তি ছিল। সেই মূর্তি আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের।

মূর্তির পেছনদিকে একটা বড় পাঠাগার। তখন পাঠাগারটি বন্ধ ছিল। পাঠাগারের পেছনে একটা হোটেল আছে। ওই হোটেলে রাত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিছু দূরে আছে 'অপুর পথ' বলে একটি পথ। সেই পথ ধরে কিছু দূর এগোবার পর বিভূতিবাবুর আদি বাসস্থান দেখতে পেলাম।

'অপুর পথ' দিয়ে হাঁটার সময় আমার অপু ও দুর্গার কথা বারবার মনে পড়ছিল।

কিংশুক দে (বয়স ১১)

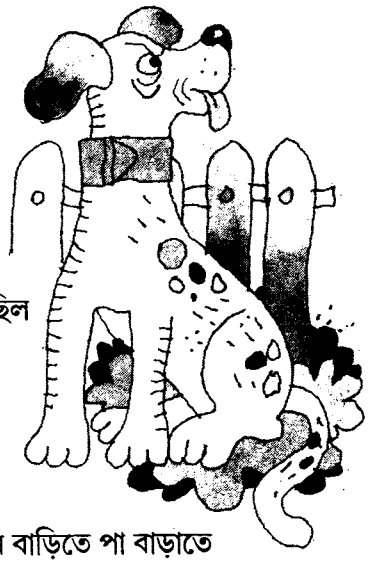

একটা কুকুর

আমাদের বাড়িতে ছিল
একটা কুকুর
পাহারা দিত সে
সারা রাত দুপুর
অচেনা লোক
ঢুকত না পাড়াতে
সাহস পেত না চোর বাড়িতে পা বাড়াতে

জ্যোৎস্না দে (বয়স ৭)

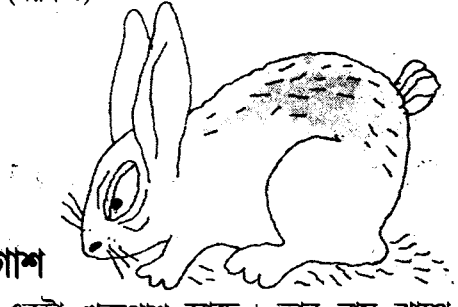

দুষ্টু খরগোশ

আমার একটা খরগোশ আছে। তার নাম ঝাম্পু। ঝাম্পু একটি ছেলে-খরগোশ। তার গায়ের লোমের রঙ ধবধবে সাদা এবং চোখ টকটকে লাল। প্রথম যখন ও আমাদের বাড়িতে এল তখন ও খুব রোগা ছিল। সেদিন বিকেলে আমি খেলতে গেলাম না। ওকে ঘাস-পাতা খাওয়ালাম। প্রথমে ও খাচ্ছিল না, পরে আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

ওর সবচেয়ে ভাল লাগে ঘাস। ওকে ঘাস দিলে ও তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ করে ফেলে। অন্য অনেক কিছুও খায়। যেমন বাঁধাকপির পাতা, কড়াই,ওলকপির পাতা, ফুলকপির পাতা, বরবটি, আলু, মচমচে বিস্কুট, ঝুরঝুরে ভাত ইত্যাদি।

ওকে যদি বাটি করে জল দেওয়া হয়, ও সেটা উলটে রেখে দেয়। ঝাম্পু কাগজ চিবোতে খুব ভালবাসে। দু-পায়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াতেও পারে। আমি যখন ওকে খাবার দিতে যাই, তখন ও দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝাম্পু ছুটতে আর লাফাতে খুব ভালবাসে। বিকেলে ঝাম্পুকে খাঁচা থেকে বার করা হলে ও আমাদের বাগানের গোলাপ গাছটার নীচে ছুটে যায়। আমি ধরতে গেলেই ও অন্যদিকে পালায়। ওর সঙ্গে তখন দৌড়ে পারি না।

ঋষিন হালদার (বয়স ১০)

ধাঁধা

প্রোনাউন নিয়ে ছোট্‌কার দেওয়া সেই ধাঁধাটায় আমার উত্তর ঠিক-ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু ছোট্‌কা তাতেও বোধহয় পুরো খুশি নয়। কেননা, এর পরেও দু-একবার, সময়সুযোগ পেলেই, ছোট্‌কা আমাকে এমন-সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছে, যার মধ্যে লুকনো সেই প্রোনাউন। হায়, কেন যে ভুল করেছিলাম!

যেমন ধরো, সেদিন রবীন্দ্রসদনের ব্যাপারটা। শিশু-উৎসবের টিকিট এনেছিল ছোট্‌কা। দুজনে মিলে যাব। একটা দারুণ ছোটদের নাটক হবে সেদিন। শিশুরঙ্গনের প্রোডাকশন। সন্ধেবেলা এসে ছোট্‌কা বাড়ি থেকে নিয়ে গেল আমায়। দু-এক মিনিট দেরিতে ঢুকেছি আমরা। ঘুটঘুটে অন্ধকার তখন হলের মধ্যে। ছোট্‌কা সোজা গিয়ে একেবারে সামনের দিকে দুটো ফাঁকা সিটে বসে পড়ল। নাটকের প্রথম দৃশ্যটা শেষ হতেই টর্চ হাতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে আমাদের টিকিট দেখতে চাইলেন। ছোট্‌কা তাঁকে টিকিট দেখাল। তিনি আমাদের সেখান থেকে তুলে মধ্যিখানের রোতে দুটো ফাঁকা সিটে বসিয়ে দিলেন। সারা হল জুড়ে তখন ফেটে পড়ছে হাততালি। আসলে দুটো দৃশ্যের মাঝখানে যতবারই একটু ফাঁক, ততবারই দেখলাম, সারা হলের ছোটরা হাততালি দিয়ে জানাচ্ছে নিজেদের খুশি ও উল্লাস। এর আগে আমি রবীন্দ্রসদনে ছোটদের নাটক দেখিনি কখনও। তাই এমন হাততালিও শুনিনি।

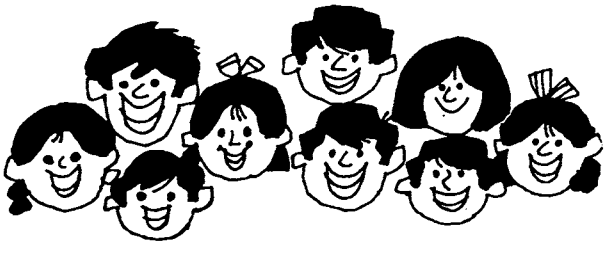

সে যাক। নাটক তো শেষ হল। ফেরার পথে বাসে বসে হঠাৎ ছোট্‌কা বলল, "একটা পাঁচ অক্ষরের ইংরেজি শব্দ বল তো, যার মধ্যে পর পর লুকনো চার-চারটে পার্সোনাল প্রোনাউন। আর হ্যাঁ, শব্দটা যাকে বোঝায়, তাকে আমরা আজই দেখেছি রবীন্দ্রসদনে। নাটক দেখতে গিয়ে।"

ব্যস্। আমি তো সেই থেকে ভেবে যাচ্ছি, কী উত্তর হবে। পারিনি এখনও। তোমরা বলতে পারো? এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা**।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আটটা আট দিয়ে হাজার হয় কীভাবে বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

পুংহরুষসি

গতবারের উত্তর ॥ (১) I, he, you, they, their, myself, himself, yourself, ourselves, themselves (অন্য উত্তরও হয়)। (২) HEROINE। (৩) শ্যামায়মান।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২	৩	■	৪	৫	৬
৭			■	৮		
৯		■	■	■	১০	
■	১১		১২			■
১৩	■	■		■	■	১৪
	■	১৫			■	
১৬		■		■	১৭	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) চিনি বা গুড়ের তৈরি মেঠাই। (৪) সদৃশ। (৭) যুদ্ধ। (৮) দক্ষিণবঙ্গের নদী। (৯) এককালে ঋষি বা দেবতারা খুশি হয়ে মানুষকে দিতেন। (১০) বড় গাছ, অনেকদিন বাঁচে। (১১) বণিক্। (১৫) দুই রথীর যুদ্ধ। (১৬) কদম। (১৭) ভীষণ।

উপর-নীচ : (১) ইন্দ্র। (২) পদ্মফুল। (৩) উৎকৃষ্ট অংশ। (৪) বাতি। (৫) বরের সঙ্গে থাকে। (৬) কপাল। (১২) দশরথের পুত্র। (১৩) সুগন্ধি ফুলবিশেষ। (১৪) গম।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

প	ক্ষ	■	ক	■	ব্যা	ধ
য়া	■	মা	রী	চ	■	ম
র	■	ধু	■	ন্দ্রা	■	নি
■	■	ক	পো	ত	■	■
ম	যূ	রী	■	প	রা	গ
শ	■	■	■	■	■	ন্ধ
ক	ব	ন্ধ	■	অ	থ	র্ব

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য দরকার মাত্র ৬টা কাঠি। টুথপিক বা ব্যবহৃত দেশলাইকাঠি।

কাঠি ছটাকে টেবিলের ওপর নীচের অঙ্কের মতো সাজাও—

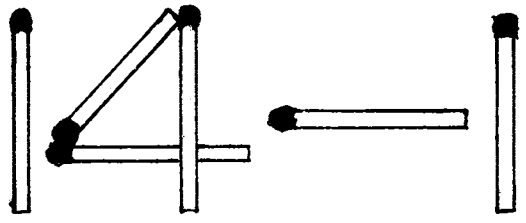

কী অঙ্ক হল ? ১৪—১। এর উত্তর যে ১৩, সে তো আমরা সবাই জানি। এবার শোনো, কী করতে হবে।

এর থেকে একটা মাত্র কাঠিকে তুলে নিয়ে এমনভাবে ফের বসাতে হবে, যাতে নতুন একটা অঙ্ক টেবিলের ওপর তৈরি হয়, আর সেই নতুন অঙ্কের উত্তর হয় ৫।

উত্তরটা মনে-মনে করতে হবে, টেবিলে দেখানো থাকবে না। যেমন এবারের অঙ্কটাই শুধু দেখা যাচ্ছে, ১৩ উত্তরটা দেখানো নেই। ব্যস, এবার করে ফেলো। নিজে করো, পরে বন্ধুদের দেখিয়ো না-হয়।

আমার কিন্তু উত্তর হয়ে গেছে। তোমাদের না হলে তো সেটা দেখাব না। তাই, যাদের হয়ে গেছে তাদের জন্য চুপিচুপি লিখে রাখছি—

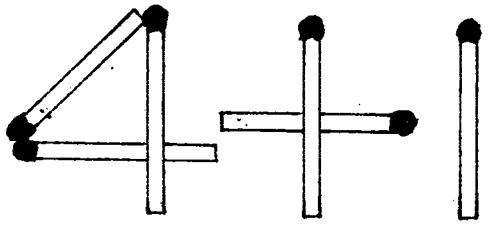

এ-অঙ্কের উত্তর ৫। তাই না ?

মজারু

হাসিখুশি

"তোমার সঙ্গে একটা বাঁদরের পার্থক্য কতটুকু বলতে পারো ?"

"তোমার আমার মধ্যে দূরত্বটা মেপে নিলেই বুঝতে পারবে।"

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো পিকলু, 'আমার বয়স দশ বছর'—এটা কোন্ টেন্স ?"

ঝটপট উত্তর দিল পিকলু, "পাস্ট টেন্স।"

"আপনার কোনও বইয়ের জন্য যদি নোবেল প্রাইজ পান, তাহলে ওই টাকাটা দিয়ে কী করবেন স্বদেশবাবু ?"

"বেশ কিছু বই ছাপাব। তাতে আরও দু-একটা নোবেল প্রাইজ জুটে যেতে পারে।"

"কাল রাত্রে একটা চোর ঢুকেছিল আমার ঘরে। আমার চোখের সামনে সব কিছু নিয়ে পালাল।"

"তুমি দেখলে, চিৎকার করলে না ?"

"পাগল ! ও যদি মালপত্রগুলো ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলত ?"

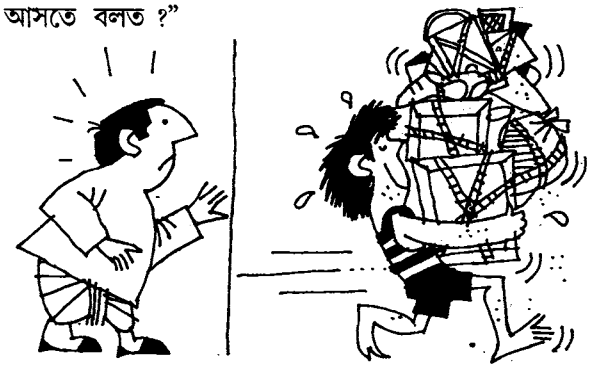

"বাবাই, তুমি এবারে স্কুলে কতগুলো প্রাইজ পেলে ?"

"দুটো। একটা সবচেয়ে কম দিন স্কুলে যাওয়ার জন্য, আরেকটা সব বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ার জন্য।"

"বুকাই, তুমি আজকাল বড় ভিতু হয়ে যাচ্ছ, এখন থেকে সাহসী হওয়ার চেষ্টা করো।"

"সেইজন্যই তুমি কাল আরশোলা দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে সাহস দিচ্ছিলে, তাই না ছোট্কা ?"

"তোমাকে চল্লিশ কেজি ওজনের লোহা আর সমান ওজনের তুলো বাড়ির ছাদ থেকে ফেলতে বলা হল। কোন্টা আগে নীচে পড়বে ?"

"কোনওটাই পড়বে না।"

"তার মানে ?"

"তার মানে আমি আশি কেজি ওজনের জিনিস কখনওই তুলতে পারব না।"

ছবি : দেবাশিস দেব

বুটিদার ফেট্টি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মায়ের মৃত্যুর পর হেলেন স্টোনার ও তার বোন জুলিয়ার অভিভাবক হন তাদের বদমেজাজি বিপিতা । মায়ের উইলে তাঁর টাকাকড়ি দুই বোনকে দেওয়া হয়েছে । জুলিয়ার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই সে মারা যায় । তারও আগে পরপর কয়েক রাত্রি সে শিসের শব্দ শুনেছিল । তার অন্তিম উক্তি বুটিদার ফেট্টি । বেদেরা মাথায় বুটিদার রুমাল বাঁধে, সে কি তারই কথা বলেছিল ? হেলেনও সম্প্রতি শিসের শব্দ শুনেছে । ভয় পেয়ে সে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে । হেলেন চলে যাবার পরে তার বিপিতা আসেন । হোমসকে তিনি ভয় দেখান । সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর দৈহিক শক্তিও প্রচণ্ড । হোম্‌স অবশ্য তাতে ভয় পান না । তিনি বেরিয়ে যান তথ্য-সংগ্রহের কাজে । তারপর

শার্লক হোমস বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল । আমি চুপচাপ বসে রইলুম । আমার হাতে কোনও কাজ নেই । সুতরাং বসে-বসে ভাবতে লাগলুম এই অসহায়া মহিলার কথা । যতই ভাবি, ততই মন খারাপ হয়ে যায় । এরই মধ্যে শার্লক হোম্‌স তার কাজ সেরে বাড়ি ফিরল । তখন একটা বেজে গেছে । তার হাতে একটা নীল রঙের কাগজ । কাগজটার দু' পিঠেই নানান রকম সংখ্যা আর 'নোট্‌স' করা । সে-সব সংখ্যা আর নোট্‌স-এর কোনও অর্থ আমার বোধগম্য হল না ।

হোমস বললে, "আমি সেই ভদ্রমহিলার উইলটা পড়লুম । তারপর হিসেব করে দেখলুম যে, ভদ্রমহিলা যখন মারা যান, তখন তাঁর সম্পত্তির মোট দাম ছিল ১১০০ পাউণ্ড । এখন অবশ্য চাষের জমির বাজারদর পড়ে গেছে বলে ওই সম্পত্তির দাম দাঁড়িয়েছে এই ধরো, ৭৫০ পাউণ্ডের মতো । উইলের শর্ত অনুযায়ী সম্পত্তি তিন ভাগ হবে । তা হলে বিয়ের পর প্রত্যেক মেয়ে পাবে ২৫০ পাউণ্ড আর ডাক্তারের ভাগে পড়বে ২৫০ পাউণ্ড । ২৫০ পাউণ্ড মানে কিছুই নয় । যাকে বলে চটকস্য মাংস । যদি একজনও বিয়ে করে, তা হলেই ভদ্রলোক অসুবিধেয় পড়বেন । দুজন করলে তো কথাই নেই ।...যাক, আমার পরিশ্রমটা বৃথা যায়নি । অন্তত এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়ে দুটির বিয়ে না হলে ভদ্রলোকেরই লাভ হবে । বুঝলে ওয়াটসন, ব্যাপারটা ক্রমেই খুব ঘোরালো আর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে । নাহ্, এ নিয়ে আলোচনার আর একদম সময় নেই । তার ওপর ভদ্রলোক টের পেয়ে গেছেন যে, এ ব্যাপারে আমরা নাক গলাতে শুরু করেছি । তাই তুমি তৈরি হলেই আমরা একটা গাড়ি ধরে ওয়াটারলু স্টেশনের দিকে এগোতে পারি । ভাল কথা, তোমার রিভলভারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না । যে-লোক লোহার ডাণ্ডাকে অক্লেশে বেঁকিয়ে দিতে পারে তাকে শায়েস্তা করতে 'এলি' কোম্পানির দু'নম্বরের চাইতে ভাল ওষুধ আর কিছু নেই । রিভলভার আর টুথব্রাশ, এছাড়া আর কিছু নেবার দরকার নেই ।"

আমরা যখন ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছলুম, তখনই লেদারহেডে যাবার একটা ট্রেন ছাড়ছিল । আমরা সেটাতে উঠে পড়লুম । তারপর লেদারহেড স্টেশনে নেমে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলুম । আমাদের গাড়ি সারের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল । দিনটা বেশ সুন্দর । নীল আকাশে তুলোর মতো দু'একটা সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল । চারদিক সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল । রাস্তার দু'ধারের গাছে গাছে দু'একটা করে কচি পাতা বেরুতে শুরু করেছে । আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব হচ্ছিল । মনে হচ্ছিল, চারদিকে বসন্তকাল আসি-আসি করছে, অথচ আমরা এখন এমন একটা ঘটনার মোকাবিলা করতে চলেছি, যেটা অত্যন্ত বীভৎস আর নোংরা । বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে টুপিটা সামনের দিকে টেনে এনে চোখে চাপা দিয়ে আমার বন্ধু গাড়ির সামনের আসনে চুপ করে বসে ছিল । বুঝলুম, সে গভীরভাবে কোনও কিছু চিন্তা করছে । হঠাৎ সে নড়েচড়ে উঠে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে ঠেলা দিল ।

"ওই দ্যাখো ।" হোমস বললে ।

দেখলুম আমাদের সামনে বিশাল বিশাল গাছপালায় ভর্তি এক বিরাট বাগান । বাগানের ভেতরে একটা বড় বাড়ির ছাদ আর দেওয়ালের অংশ গাছের সারি আর ডালপালার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ।

আমাদের গাড়ির কোচোয়ানকে হোমস বললে, "এটা কি স্টোক মোরান ?"

কোচোয়ান বললে, "হাঁ । আর ওইটে ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের বসতবাড়ি ।"

"ওইখানে কিছু মেরামতির কাজ হচ্ছে । আমরা ওইখানেই যাব," হোমস বললে ।

রাস্তার বাঁ দিকে মাঝে-মাঝে ঘরবাড়ি নজরে পড়ছিল । সেগুলো দেখিয়ে কোচোয়ান বললে, "ওইদিকে গ্রাম । তবে আপনারা যদি ডঃ রয়লটের বাড়ি যেতে চান, এইখানে নেমে পড়ে মাঠ দিয়ে চলে যান । তাতে সুবিধে হবে, তাড়াতাড়িও হবে । ওই যে ওই ভদ্রমহিলা হেঁটে যাচ্ছেন ।"

হোমস কপালে হাত ঠেকিয়ে আলো থেকে চোখ ঢেকে ভাল করে দেখে বললে, "আমার মনে হচ্ছে উনি মিস স্টোনার ।...হ্যাঁ, তোমার কথামতো আমাদের এখানেই নেমে পড়ে হাঁটাপথে যাওয়াই ভাল ।"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলুম । আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আবার উলটো মুখে লেদারহেডের দিকে চলল ।

মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে হোমস বললে, "ভালই হল যে, কোচোয়ান আমাদের ঠিকেদারের লোক বলে মনে করেছে । ও জানল, আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি । তাই আমাদের এখানে আসা নিয়ে ও আর গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে গুলতানি করবে না ।...গুড্ আফটারনুন মিস স্টোনার, দেখছেন তো আমাদের যা কথা তাই কাজ ।"

আমাদের মক্কেল আমাদের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন । তাঁর মুখ দেখেই বুঝলুম যে, আমরা আসায় তিনি

খুবই খুশি হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে করতে তিনি বললেন, "আপনারা আসবেন বলে আমি সেই কখন থেকে ছটফট করছি। সব কিছুই ঠিকঠাক করে রেখেছি। ডঃ রয়লট লণ্ডন থেকে এখনও ফেরেননি, সন্ধের আগে ফিরবেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"ডঃ রয়লটের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।" তারপর হোমস সকালবেলায় যা ঘটেছিল তা মিস স্টোনারকে বললে। হোমসের কথা শুনতে শুনতে মিস স্টোনারের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল।

"হায় ভগবান। উনি নির্ঘাত আমার পিছু-পিছু গেছেন," মিস স্টোনার বললেন। আমার মনে হল যে, তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ওহ্, কী সাংঘাতিক ধূর্ত লোক। ওঁর হাত থেকে কী করে যে মুক্তি পাব তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না। ফিরে এসে কী করবেন কী বলবেন কে জানে!"

হোমস বললে, "দেখুন, এখন থেকে ওঁকেও একটু সমঝে চলতে হবে! শিগগিরই উনি টের পাবেন যে, এমন একজন লোকের খপ্পরে উনি পড়েছেন, যে ওঁর চাইতে ঢের ঢের ধুরন্ধর। যাই হোক, আজ রাত্তিরে আপনি কোনও ভাবেই ওঁর কাছে যাবেন না। যদি উনি আপনাকে মারধোর করার চেষ্টা করেন তো আপনাকে আপনার মাসির কাছে হ্যারোতে পৌঁছে দেব। যাই হোক, এখন আমাদের হাতে যে অল্প সময় রয়েছে, সেটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাই চলুন, যে ঘরগুলো দেখতে এসেছি আগে সেগুলো ভাল করে দেখে নিই।"

বাড়িটা পাথরের। বাইরেটা ছাই-ছাই রঙের। কোথাও-কোথাও দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ পড়ে গেছে। বাড়িটার মাঝখানটা উঁচু। দু'পাশে দুটো অংশ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় কাঁকড়া দাড়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটার বাঁ দিকের অবস্থা শোচনীয়। জানালা-টানালা সব ভেঙে পড়েছে। জানালাগুলো কাঠের পাটা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় ছাদটা ধসে গেছে। বাড়ির মাঝখানটার অবস্থা ওই অংশের চেয়ে ভাল। সারানো হয়েছে। তবে ডান দিকটা দেখলেই মনে হয় মূল বাড়িটার চাইতে নতুন। চিমনি থেকে মাঝে-মাঝে বেরুনো নীল ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যায় যে, এদিকে লোকের বসবাস আছে। এই অংশের এক জায়গায় অবশ্য ভারা বাঁধা রয়েছে। কোনও-কোনও জায়গায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে তখন কোনও রাজমিস্ত্রিকে ওখানে বা ওর কাছাকাছি কাজ করতে দেখলুম না। হোমস খুব ধীরে-ধীরে সেই অযত্নে রাখা অপরিচ্ছন্ন বাগানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে জানালার কাছে গিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

"মনে হয়, এই ঘরটা আপনার। তার পরেরটা আপনার বোনের। আর তারও পরেরটা ডঃ রয়লটের। ডাক্তারের ঘরটা মনে হচ্ছে মূল বাড়ির লাগোয়া, তাই নয়?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এখন আমি আমার বোনের ঘরটা ব্যবহার করছি।"

"হ্যাঁ, যতদিন না আপনার ঘরের মেরামতি শেষ হচ্ছে। তবে বাইরে থেকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে, দেওয়ালটা সারানোর কোনও দরকার আছে।"

"কোনও দরকার নেই। এ শুধু একটা ছুতো করে আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দেওয়া।"

"আহ্-হা! এটা একটা ভাববার কথা বটে। আচ্ছা, এর উলটো দিকে বারান্দা, তাই তো? আর বারান্দা দিয়ে ওই ঘরগুলোয় ঢুকতে বেরুতে হয়। আচ্ছা, বারান্দার দিকে কি জানালা আছে?"

"আছে। তবে সেগুলো খুবই ছোট। ওই জানালা দিয়ে কারও পক্ষেই ঢোকা বা বেরুনো সম্ভব নয়।"

"আপনারা তো ঘরের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই দিক দিয়ে কারও পক্ষে আপনাদের ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। আচ্ছা, আপনি একবার ঘরে গিয়ে জানালাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন তো।"

মিস স্টোনার হোমসের কথামতো কাজ করলেন। হোম্‌স জানালাটা নানা রকম ভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সেটাকে বহুভাবে খোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জানালার পাল্লা খোলা গেল না। খোলা যাবে কী করে? কোথাও এমন একটুও ফাঁক নেই, যেখান দিয়ে কোনও ছুরির ফলা ঢোকানো যেতে পারে। হোমস তার আতশকাঁচ দিয়ে জানালার কব্জাগুলো দেখলে। লোহার মোটা পাত দিয়ে তৈরি করা কব্জাগুলো দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে সেঁটে বসানো।

"হুঁ।" গালে হাত বুলোতে-বুলোতে হোমস বললে, "ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যে-রকম ভেবেছিলুম, সে-রকম তো নয়। ভেতর থেকে বন্ধ থাকলে এ-জানালা বাইরে থেকে খুলে ঘরের ভেতর ঢোকা তো অসম্ভব ব্যাপার।...চলো এখন ঘরের ভেতরটা দেখি, যদি কোনও রকম হদিস পাওয়া যায়।"

একটা ছোট দরজা দিয়ে আমরা বারান্দায় ঢুকলুম। বারান্দাটা চুনকাম করা। এই বারান্দা দিয়েই ঘরে ঢুকতে হয়। অন্য কোনও ঘরে না গিয়ে হোমস প্রথমেই মাঝের ঘরে গেল, যে-ঘরে এখন মিস স্টোনার থাকছেন। এই ঘরেই তাঁর বোন জুলিয়া রহস্যময়ভাবে মারা পড়েছে। ঘরটা আকারে বেশ ছোট। নিচুও বটে। ঘরের মধ্যে একটা সাবেকি আমলের মস্ত বড় ফায়ারপ্লেস। এক কোণে একটা ছোট আলমারি। আর এক কোণে একটা একজনের শোবার মতো খাট। জানালার এক পাশে একটা ড্রেসিং টেবিল। আর দুটো বেতের চেয়ার। ঘরের আসবাব বলতে এই। ঘরের দেওয়ালে ওক কাঠের প্যানেল। প্যানেলের পালিশ চটে গেছে। কোথাও কোথাও পোকা লেগেছে। বুঝলুম বাড়িটা তৈরি হবার সময়েই ওই প্যানেল বসানো হয়েছিল। তারপর থেকে প্যানেলের আর রং-টং হয়নি। হোমস চেয়ার টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আমি কিন্তু বুঝলুম যে, সে ঘরের প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হোমস বললে, "আচ্ছা, খাটের ধারে ওই দড়িটা কেন ঝোলানো রয়েছে?"

"এটা আমাদের ওই যে কাজের লোকটি আছে, তাকে ডাকবার জন্যে।"

"দেখে মনে হচ্ছে এটা খুব বেশি দিন লাগানো হয়নি।"

"না। এই বছর-দুই হল লাগানো হয়েছে।"

"আপনার বোনের কথামতো লাগানো হয়েছিল নিশ্চয়?"

"না। আমি কখনও ওকে এটা বাজাতে শুনিনি। বা দেখিনি। নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করে নিই।"

"তা হলে তো দেখছি এই সুন্দর ঘণ্টা-টানা দড়িটা নেহাত মিছিমিছি খাটানো হয়েছে। যাই হোক, এখন ঘরের মেজেটা একবার দেখি।" কোথাও কোনও ফাঁকফোকর আছে কি না দেখবার জন্যে হোমস চোখে আতশকাঁচ লাগিয়ে কখনও বা মেজের ওপর শুয়ে পড়ল, কখনও বা কচি ছেলের মতো হামাগুড়ি দিতে লাগল। ঘরের মেজে দেখে যখন সে সন্তুষ্ট হল, তখন ঘরের প্যানেলটা ভাল করে দেখলে। সেটা দেখা হয়ে গেলে হোমস বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখলে। তারপর সেই ঘণ্টা-টানা দড়িটা ধরে এক হেঁচকা টান দিলে।

"কী কাণ্ড! এটা তো দেখছি ভুয়ো।"

"কেন, বাজছে না?"

"না। এটা কোনও ঘণ্টার তারের সঙ্গে লাগানো নেই। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তো! এই তো এখান থেকে দেখুন, এটা ঘুলঘুলির সঙ্গে একটা আংটা দিয়ে বাঁধা।"

"এ আবার কী উদ্ভট কাণ্ড। এটা তো আগে লক্ষ করিনি," মিস স্টোনার বললেন।

"সত্যিই উদ্ভট," তারপর দড়িটা টানতে টানতে খানিকটা যেন নিজের মনেই হোমস বললে, "এই ঘরটার দু' একটা বিশেষত্ব লক্ষ করবার মতো। যেমন এই ঘুলঘুলিটা। যে রাজমিস্ত্রি এটা করেছে, সে তো একদম আহাম্মক। লোকে ঘুলঘুলি করে হাওয়া-বাতাসের জন্যে। সেই জন্যে ঘুলঘুলিটা করা উচিত ছিল বারান্দার দিকে। কিন্তু বোকারাম তা না করে ঘুলঘুলির মুখটা করেছে আর একটা ঘরের দিকে।"

হোমসকে বাধা দিয়ে মিস স্টোনার বললেন, "এই ঘুলঘুলিটা কিন্তু পরে করানো হয়েছিল।"

"বোধহয় ওই ঘণ্টাটা লাগাবার সময়েই এই ঘুলঘুলিটা করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। তখন বেশ কিছু টুকিটাকি মেরামতির কাজ আর অদলবদল করা হয়েছিল।"

"বেশ অভিনব অদলবদল। ভুয়ো ঘণ্টা-টানা দড়ি, এমন ঘুলঘুলি যা দিয়ে বাইরের হাওয়া ঢুকবে না।...মিস স্টোনার, যদি আপত্তি না করেন তো এখন আমরা অন্য ঘরগুলো দেখব।"

ডঃ রয়লটের ঘর অন্য ঘর দুটোর তুলনায় আকারে বড়। অন্য ঘরের মতো এ-ঘরেও আসবাবপত্র কম। একটা ক্যাম্পখাট, একটা বই ঠাসা কাঠের র‍্যাক। বইগুলো বেশির ভাগই বিজ্ঞান বিষয়ের। খাটের পাশেই একটা আরাম-কেদারা। ঘরের অন্য আসবাব বলতে আর যা কিছু, তা হল দেওয়ালের ধারে রাখা একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল, আর বড় একটা আয়রনসেফ। হোমস ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জিনিস ভাল করে দেখলে।

আয়রনসেফটায় টোকা মেরে বললে, "এর মধ্যে কী আছে?"

"ওঁর সব দরকারি কাগজপত্র।"

"ও। এর ভেতরটা আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলুম। ভেতরটা

কাগজপত্রে ভরতি।"

"আচ্ছা, এর মধ্যে বেড়াল-টেড়াল নেই তো?"

"কী আশ্চর্য। সেফের মধ্যে বেড়াল থাকতে যাবে কেন?"

"তা হলে এটা কী?" সেফের ওপর থেকে হোমস একটা ডিশ পেড়ে দেখালে। ডিশটাতে দুধ রয়েছে।

"না, আমাদের পোষা বেড়াল নেই। তবে বাড়িতে একটা চিতা আর বেবুন আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক কথা। চিতা যদিও আসলে বড় আকারের বেড়ালই বটে, তবু এই ছোট ডিশের সামান্য দুধটুকুতে ওর খিদে মিটবে কি না বলা শক্ত।...তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জামশিদ নাসিরি
(ফাইনালের একমাত্র গোলদাতা)

ইস্টবেঙ্গল ভারত-সেরা

অশোক রায়

ফেডারেশন কাপে যাবার আগে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা দলের সাফল্যের ব্যাপারে যতখানি আশ্বস্ত ছিলেন, কোচ পি· কে· ছিলেন ঠিক ততটাই চিন্তিত। স্টার এবং সুপার-স্টারে ঠাসা দলের মধ্যে টিম-স্পিরিট ব্যাপারটাও যেন কিছুতেই আনা সম্ভব হচ্ছিল না। গ্রুপ লিগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল এগোচ্ছিল যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের রেকর্ড সমীহ করার মতো। দু'বার এককভাবে এবং দু'বার যুগ্মভাবে বিজয়ী হবার গৌরব তাদের। গ্রুপের প্রথম খেলায় সাত গোল দিয়ে মোহনবাগান শুরু করে চমৎকারভাবে। এবং গ্রুপের শীর্ষস্থান পায় তিনটি ম্যাচে দশ গোল দিয়ে।

সেমিফাইনালে মোহনবাগান বনাম সালগাওকর ম্যাচ নিয়ে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ দুটি দলই তিনটি করে ম্যাচ জিতে গ্রুপের বিজয়ী। তা ছাড়া দুটি দলই ছিল দুই রাজ্যের চ্যাম্পিয়ান টিম। দু'দফার খেলাতেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মোহনবাগানকে রুখে দিয়ে সালগাওকর বুঝিয়ে দিল ভারতীয় ফুটবলে গোয়ানিজ স্টাইল কত দ্রুত পরিণত এবং ধারালো হয়ে উঠছে। সমর্থকদের ধুক্‌পুকুনির মধ্যে দু'দলই নামল টাইব্রেকারে। প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে টাইব্রেকারে ৩-৩। শেষপর্যন্ত সাডেন ডেথ-এ এক গোলে জিতে ফাইনালে গেল মোহনবাগান। বারের নীচে গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষের প্রবল প্রতাপ কোনওক্রমে রক্ষা করল মোহনবাগানের ঐতিহ্য। প্রতাপ মোহনবাগানকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু নিজে পেলেন দারুণ চোট।

ওদিকে ইস্টবেঙ্গল পঞ্জাব স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের বিপক্ষে প্রথম-দফা সেমিফাইনালে এক ঝটকায় দু'গোল দিয়ে এমনই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করল যে, দ্বিতীয় দফার খেলায় লাগাম হয়ে গেল হাতছাড়া। কাগজে-কলমে ভারত-সেরা দল ছন্নছাড়া ফুটবল খেলে হেরে গেল এক গোলে। দু'দফায় মোট ২-১ গোলের ব্যবধানে জিতে কোনওক্রমে ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল।

কাঁটায়-কাঁটায় তিনটে একচল্লিশ মিনিটে ফাইনাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমূর্তি ধরল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ জার্সি পরা প্রতিটি ফুটবলারকে দেখে মনে হচ্ছিল এককভাবে একটি জয় পাবার জন্যে ইস্টবেঙ্গল মরিয়া। ডিপ-ডিফেন্সে তরুণ দে ছিলেন সর্বোত্তম। ইস্টবেঙ্গলের গোলমুখে শূন্যে ভাসানো সেন্টার লক্ষ করে দীর্ঘকায় কৃষ্ণগোপাল যতবারই লাফিয়েছেন, ততবারই তরুণ অন্তত ছ ইঞ্চি ওপরে বল ছুঁয়েছেন মাথায়। মোহনবাগানের গেম-মেকার প্রশান্তকে অকেজো করার কাজে 'পুলিশম্যানের' ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন সুর্নিমল চক্রবর্তী। বলা বাহুল্য, প্রশান্তর নিষ্ক্রিয়তার ফলেই মোহনবাগানের সাপ্লাই-লাইনের মুখ রুদ্ধ হয়। ওদিকে

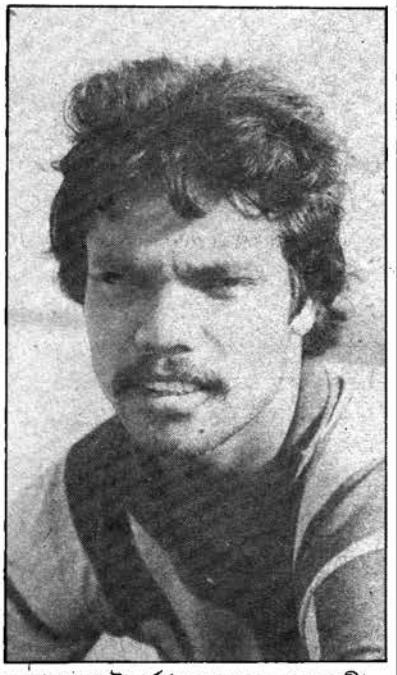

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (ব্যূহরক্ষায় সজাগ প্রহরী)

পি· কে· ব্যানার্জি (সফলতম কোচ)

আবার এই ম্যাচেও সুইপার ব্যাকের ভূমিকায় অসাধারণ খেললেন অভিজ্ঞ ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ভারতের সেরা টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মনোরঞ্জন নির্বাচিত হওয়ায় এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, এখনও তিনি ভারতের সর্বোত্তম স্টপার। জানাটা খুবই দরকার, কেন ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না মনোরঞ্জন, যোগ্যতার চুড়োয় থাকা সত্ত্বেও।

ফাইনালে প্রবলতর প্রতিপক্ষের ভূমিকায় থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি ইস্টবেঙ্গল। অতিরিক্ত সময়ের খেলা যখন মিনিট চারেক গড়িয়েছে তখন ওভার-ল্যাপে উঠে-আসা অলোক আড়াআড়ি বল বাড়ালেন দেবাশিসকে। ট্যাক্‌ল করার জন্যে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এলেন সত্যজিৎ। ছোট্ট করে ওয়াল-পাস খেলে নিয়েই দেবাশিস দেখলেন জামশিদ দাঁড়িয়ে আছেন ফাঁকায়। দেবাশিসের পা থেকে নিখুঁত বল বেরুল জামশিদের ঠিকানা নিয়েই। পায়ে পাওয়া মাত্রই জামশিদ বল ঠেললেন গোলে। গোটা টুর্নামেন্টে জামশিদ উল্লেখযোগ্য কিছুই করেননি। কিনতু এই গোলের সুবাদে তিনি দুটি অনন্য রেকর্ড গড়লেন। উপর্যুপরি তিনবছর ফাইনাল ম্যাচে গোল করে দলকে জেতানোর হ্যাট্‌ট্রিক করলেন তিনি। সেইসঙ্গে স্পর্শ করলেন ফেডারেশনে আকবরের করা চোদ্দটি গোলের রেকর্ডটিও।

এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল এককভাবে জিতল ফেডারেশন কাপ। এবং প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

খুব ছোট্ট যা'য়েও ধুলো লাগতে পারে
যার ফলে তা দূষিত হতে পারে, কষ্ট বেড়ে যেতে পারে

অড়াতাড়ি,
ব্যাণ্ড-এড
দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিন

ব্যাণ্ড-এড
উত্তমভাবে সুরক্ষা প্রদান করে
ও দ্রুত উপশম করে

Johnson & Johnson

BAND-AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON USA

OBM/4670 BEN

বেটন কাপের যুদ্ধে

সুজয় সোম

ছেলেবেলায় বন্ধুরা মিলে হৈ-হুল্লোড় করে শুধু ফুটবল কেন, গড়ের মাঠের হকি খেলাও দেখতে যেতাম। বিশেষ করে বেটন কাপের যুদ্ধ। ইস্কুলের টিফিন খাবার পয়সা জমিয়ে, আঁকাবাঁকা টিকিটের লাইনে হাপিত্যেশ দাঁড়িয়ে থেকে, রোদ-বৃষ্টি তাচ্ছিল্য করে! কিন্তু এখন তোমরা খালি ফুটবল নিয়ে মেতে আছ। সত্তর দশকের শেষাশেষি থেকে তোমাদের বাবা-কাকা-মামারাও আর আপিস পালিয়ে হকির মাঠে হুড়মুড় করে ছোটেন না। আমাদের এই মুহূর্তের জীবনযাপনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্রিকেট আর ফুটবল। তারপর ব্যাডমিন্টন, দু-রকম টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, এমনকী খো-খো, কবাডিও পেরিয়ে, হকির জন্য এক চিলতে ভাল লাগা! সেটাও বিশ্বকাপ বা ওলিম্পিক ঘিরে। হকি-পৃথিবীতে বছরের পর বছর ভারতীয়দের দাপট, এখন ইতিহাসের বিষয়!

বেটন কাপ জিতল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স

খাঁখাঁ সবুজ গ্যালারির কাষ্ঠহাসি ছাপিয়ে ১৯৮৫ সালের ৪ মে, শনিবার, বিকেলে ফুরিয়ে গেল বেটন কাপ হকির নব্বুইতম উৎসব। রঙচঙ, গ্ল্যামার, মর্যাদা, উন্মাদনা খুইয়ে বেটন কাপের কেন আজ এমন ফ্যাকাশে চেহারা? কলকাতার নামজাদা দলগুলো ফুটবল নিয়ে মশগুল, ভারতের অন্য জায়গার ডাকসাইটে সব হকি দলও এখন আর কলকাতায় খেলতে আগ্রহী নয়। চারটে রাউণ্ড ও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের পানসে লড়াই টপকে এবারের বেটন-যুদ্ধ যখন কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল, মোহনবাগান মাঠের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তবু খুঁজে পেলাম পাঁচ-সাতশো হকিপাগল মানুষ।

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম খেলায় গোড়া থেকে কোমর বেঁধে যুঝেও এয়ার-ইণ্ডিয়াকে ২-৩ গোলে হেরে যেতে হল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কাছে। জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর ১-২ গোলে চুপসে গেল পঞ্জাব পুলিশের তারকা খেলোয়াড়দের সামনে। কলকাতার মেসিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন (এম· এম· সি·) নাকানি-চোবানি খাওয়াল (৩-১) চুরাশি সালের বেটন-চ্যাম্পিয়ান রাঁচির মেকন দলকে। ফাগোয়ারার জগতজিৎ কটন অ্যাণ্ড টেক্সটাইল্ মিলস খেলতে না আসায় জলন্ধরের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার্স (ই·এম·ই·) ওয়াকওভার পেল।

সেমিফাইনালের যুদ্ধে পড়ি-মরি অ্যাটাক করেও এম· এম· সি· হেরে গেল। আটটা পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করলে চলে! এম· এম· সি-র মোটে দুটো পেনাল্টি কর্নারের একটা চমৎকার কাজে লাগালেন রাইট ব্যাক কিশোর এক্কা। কিশোরের গোলের চার মিনিট আগে বিনয়কুমারের শর্ট কর্নার গোলটাও দেখার মতো! বিরতির মুখে একটা গোল শোধ করলেন বলবিন্দার সিং।

পরের খেলায় গোমড়া মুখে ড্রেসিংরুমে ফিরলেন পঞ্জাব পুলিশের খেলোয়াড়রা। অথচ প্রথম পর্বে তাঁরা বেদম চাপের মধ্যে রেখেছিলেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের তারকাদের। পেনাল্টি কর্নার থেকে লেফ্‌ট ব্যাক দাবিন্দার সিংয়ের গোলের পঁচিশ মিনিট বাদে এয়ারলাইন্স-ক্যাপ্টেন মেরভিন ফার্নাণ্ডেজ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল শোধ করলেন। তখন থেকেই খেলাটাকে বেমালুম মুঠোয় পুরে ফেললেন মেরভিনরা। একে একে ষোলোটা পেনাল্টি কর্নার হাঁকালেন বিনীতকুমার! তবু বাড়তি সময়েও ফের গোল না হওয়ায়, ফয়সালা হল টাইব্রেকারে। ১০-৮।

ফাইনালে দেখলাম স্পিড, স্কিল, পাওয়ারের খেলা। ই· এম· ই-র তুমুল গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে স্টিক-ওয়ার্ক অনেকটাই হারিয়ে ফেলল এয়ারলাইন্স একাদশ। উপভোগ্য লড়াইয়ের তেতাল্লিশ মিনিটে কিন্তু খেলার একমাত্র গোল করলেন মেরভিনই। চলতি বলে একেবারে কাছ থেকে নেওয়া উঁচু হিট গোলকিপারের বাঁ-পাশ দিয়ে ফসকে গেল। আটজন ডাকাবুকো আদিবাসী খেলোয়াড় ঠাসা দলের বিরুদ্ধে আক্রমণের যোগ্য সেনাপতিও ছিলেন মেরভিন। তাঁর দলের দুই ব্যাক বিনীতকুমার ও বীরেন্দ্র বাহাদুর এবং সেন্টার হাফ হরদীপ সিং মাঝ-মাঠ দখলে রেখে ডিফেন্স যেমন আঁটোসাটো করে ফেললেন, তেমনি আক্রমণের ঝড় তোলার জন্য বারে বারে বল পাচার করলেন ফরোয়ার্ডদের। হরদীপের স্টিকের কাজ, বুদ্ধিদীপ্ত খেলা দেখে সকলে মুগ্ধ! তবে বুক চিতিয়ে দারুণ খেলে (এয়ারলাইন্স-তারকাদের সতেরোটা তুখোড় পেনাল্টি কর্নার হিট আটকানো মুখের কথা?) 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' হলেন ফৌজি দলের বাঙালি গোলকিপার গোকুলকিশোর বসু।

নুয়ে পড়ল নিউজিল্যাণ্ড

রাজা গুপ্ত

ক্লাইভ লয়েডও পারেননি। অধিনায়ক হিসেবে লয়েডের মুকুটে বহু পালকের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা ফাঁকা ছিল। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বত্রাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ তো দূরের কথা, একটা টেস্টেও কখনও জেতেনি ! ১৯৭৯-৮০ সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ খুইয়ে আসে ০-১ মার্জিনে। লয়েড বিদায় নেবার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাল হাতে নিয়ে নতুন অধিনায়ক ভিভ রিচার্ডস প্রথমেই মুখোমুখি হলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। চ্যালেঞ্জটা বেশ বড় রকমই ছিল। কারণ উনিশশো আটষট্টি উনসত্তর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে অপরাজিত ছিল নিউজিল্যাণ্ড। ক্রিকেট মাঠে বিপক্ষের সর্বাধিক বিপজ্জনক বোলারের বিষ-দাঁত ভাঙতে যিনি ব্যাট হাতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও সেই ভিভ রিচার্ডস যে বহু আকাঙ্ক্ষিত জয়ের চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন এতে কোনওরকম সন্দেহ ছিল না।

নিউজিল্যাণ্ড টিমের দুর্বলতা ও ফাঁক-ফোকরগুলো খুঁজে নিতে-নিতে প্রথম দুটো টেস্ট গড়িয়ে গেল অমীমাংসিতভাবে। চার টেস্টের সিরিজে বাকি রইল দুটি টেস্ট। দীর্ঘ ষোলো বছর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়-বঞ্চিত, অতৃপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে খুঁচিয়ে দিলেন প্রথমে ম্যালকম মার্শাল, পরে অধিনায়ক রিচার্ডস নিজেই। দু' ইনিংসে এগারোটি উইকেট নিয়ে ভয়াবহ গতিতে বল করে মার্শাল ছিঁড়ে ফেললেন নিউজিল্যাণ্ডকে। আর ব্যাট হাতে মারমুখী সেঞ্চুরি করে নুন-লঙ্কায় প্রলেপ দিলেন রিচার্ডস। টেস্টে নিজস্ব উনিশতম শতরানের চেয়েও বড় তৃপ্তি, সেঞ্চুরিটি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিভের প্রথম। মার্শালের বল আর ভিভের ব্যাটের দ্বিমুখী আক্রমণে নুয়ে পড়ল নিউজিল্যাণ্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতল দশ উইকেটে। ১৯৭৯-৮০

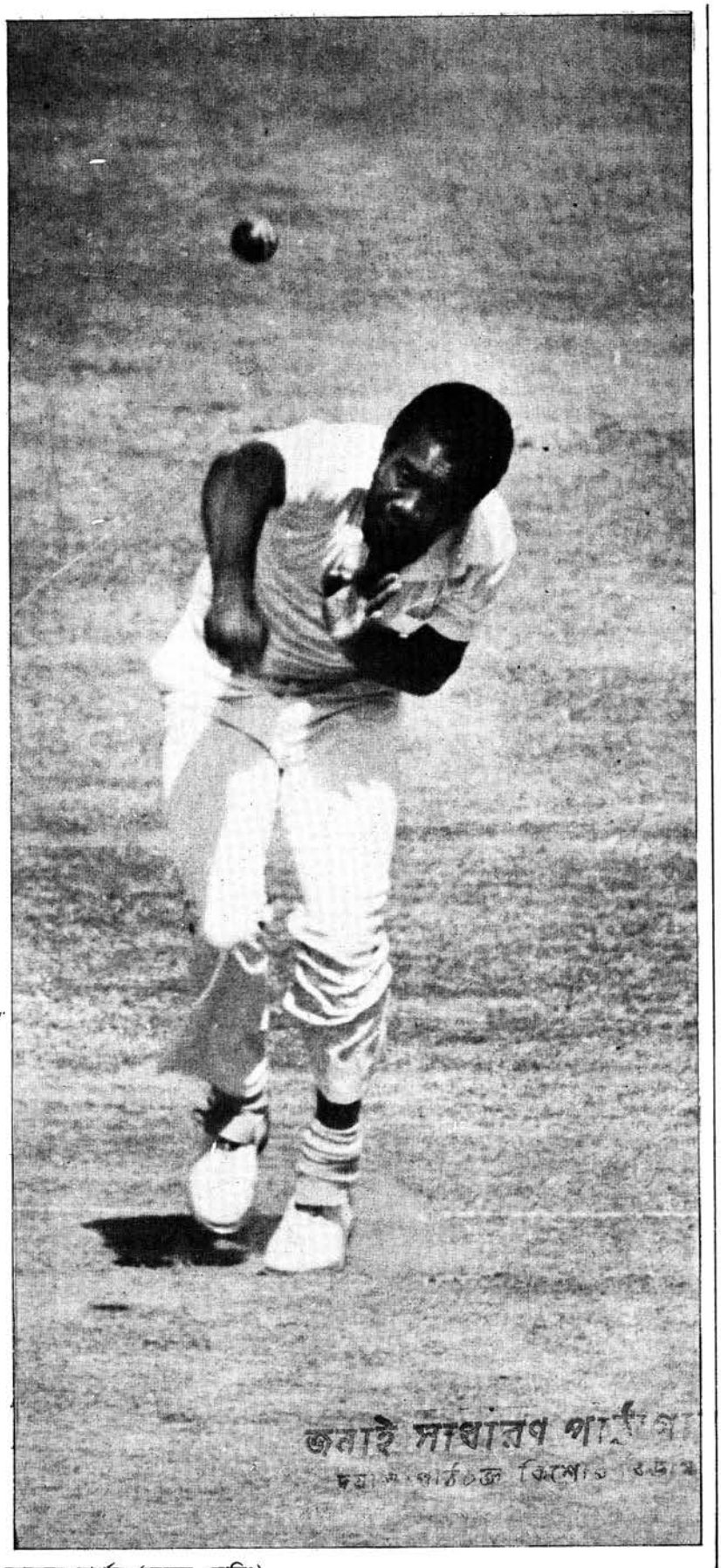

ম্যালকম মার্শাল (ভয়ঙ্কর বোলিং)

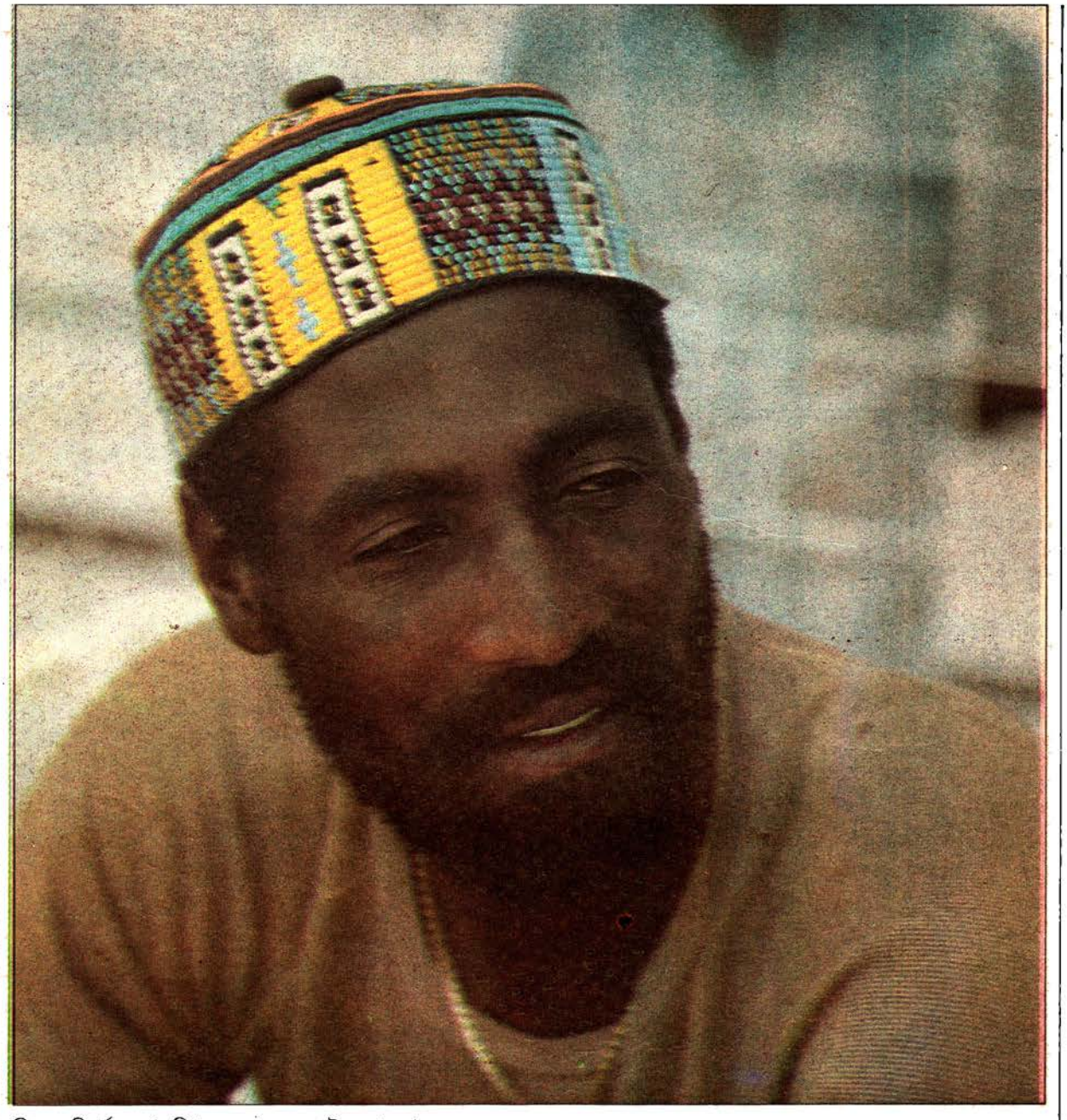

ভিভ্ রিচার্ডস (অধিনায়কত্বের শুরুতেই সাফল্য)

সালে নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে এক উইকেটে ম্যাচ হেরে যে সিরিজ একদা বিসর্জন দিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তা পুনরুদ্ধার করলেন রিচার্ডস, একেবারে সুদসুদ্ধ।

সুতরাং চতুর্থ তথা শেষ টেস্টে জয়ের গন্ধ-পাওয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আরও একটি জয়ের বাসনায়। পেস বোলারদের দাপটে চোখে সর্ষেফুল দেখল নিউজিল্যাণ্ড। এবং ফলো-অনের কবলে পড়ল ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। দ্বিতীয় দফায় অধিনায়ক জিওফ হাওয়ার্থ (৮৪) ও জেফ ক্রো (১১২) দ্বিতীয় উইকেট জুড়িতে রেকর্ড রান সংগ্রহ করেও ম্যাচ বাঁচাতে পারলেন না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার ম্যাচ জিতল দশ উইকেটে।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের স্থপতি হিসেবে যদি একজনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতেই হয়, তা হলে জয়ের সেই মহানায়কের নাম ম্যালকম মার্শাল। এই সিরিজে মার্শাল ২৭টি উইকেট নিয়ে শুধু 'ম্যান অব দি সিরিজ' হবার গৌরবই অর্জন করলেন না, সেইসঙ্গে দু' দেশের মধ্যে এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট-প্রাপ্তির রেকর্ডও স্পর্শ করলেন। মনে রাখার মতোই ঘটনা, মার্শাল ঠিক এর আগে সদ্য-সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও 'ম্যান অব দি সিরিজ' নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শুধু টেস্ট সিরিজেই নয়, ওয়ান-ডে সিরিজেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফাইভ-নিলে নিঃশেষ করে ছেড়েছে নিউজিল্যাণ্ডকে। বদলা নিয়েই শুরু করলেন ভিভ রিচার্ডস তাঁর অধিনায়কত্বের দিন।

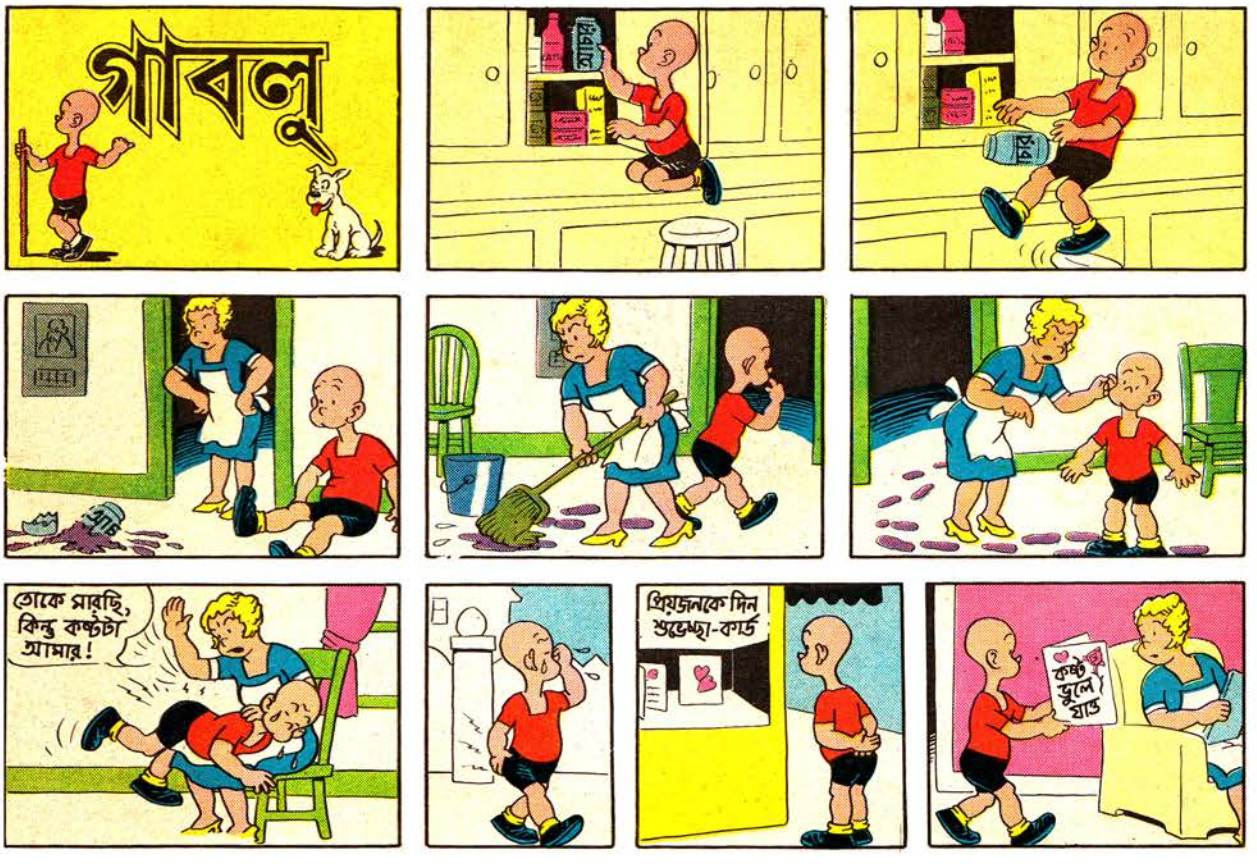
গাবলু
তোকে পাবছি, কিন্তু কষ্টটা আমার!
প্রিয়জনকে দিন শুভেচ্ছা-কার্ড
কষ্ট ভুলে যাও

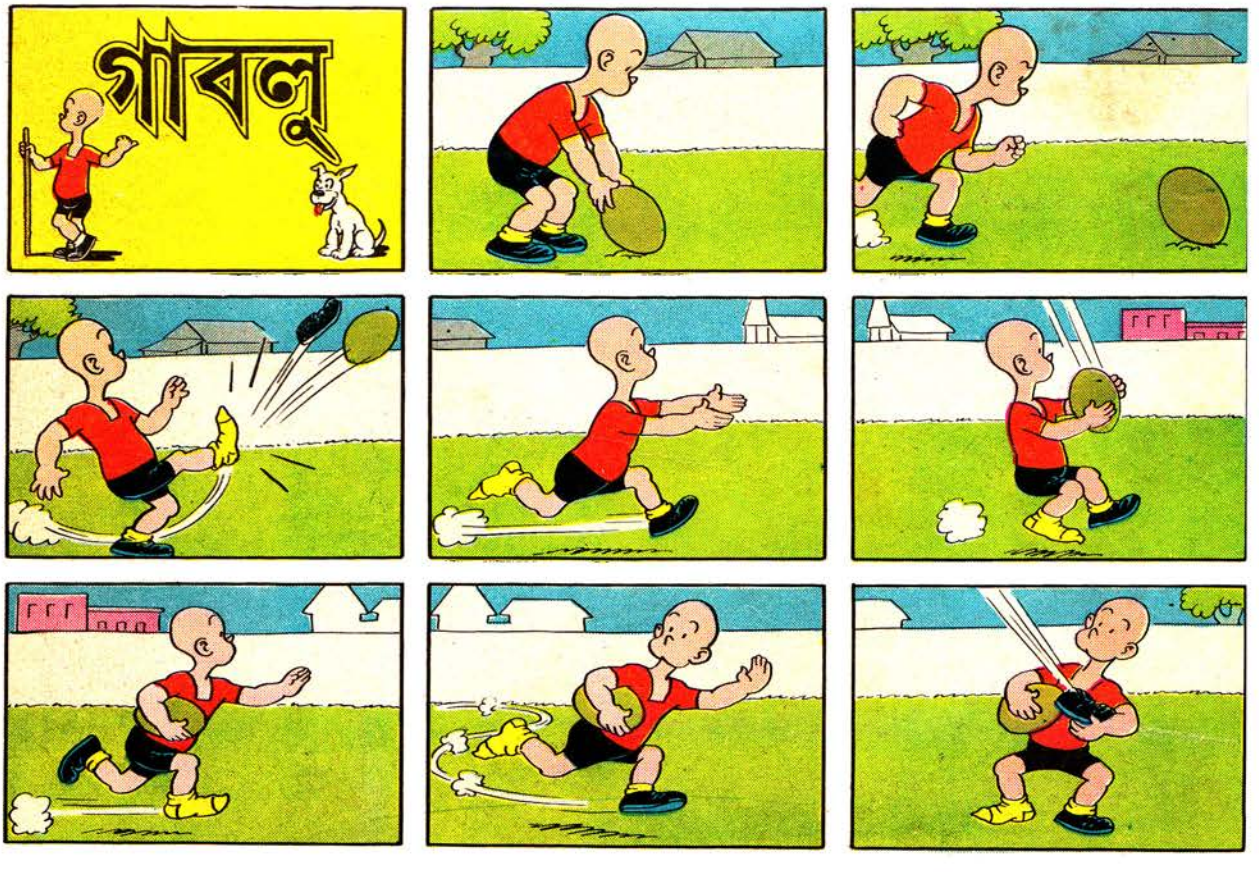
গাবলু

গরম তাড়াতে
পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে
ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা দিতে
বাদলপাখার
জুড়ি নেই

BadalFans

মেজাজে গরম কাটানো

অর্জুন সেনগুপ্ত

গরমের দেশে গরম কাটানোর মেজাজটাই আলাদা। নানাদিক আছে এই গরম উপভোগের, এবার বোধহয় সূর্যদেবের কৃপা একটু বেশী। গরম যখন এসেই পড়েছে তখন তার জন্য দুঃখ না করে কি করে একটু ঠাণ্ডা থাকা যায়, সে নিয়ে ভাবাই ভাল।

গরমে প্রথমেই যা পেতে বা খেতে ইচ্ছে করে—তা হল গিয়ে ঠাণ্ডা কিছু (তা বলে মার খেয়ে ঠাণ্ডা হওয়া কোন কাজের কথা নয়)। আর ঠাণ্ডা খাবার কথাতে সবচেয়ে আগে মনে পড়ে জিভে জল আনা আইস্‌ক্রীমের কথা। এই একটা ব্যাপারে ছোট বড় সবার মিল! কাউকে শুনেছ আইস্‌ক্রীম অপছন্দ করতে? আইস্‌ক্রীম খেতে খেতে যখন হাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর সারা মুখে, জামায় লাগে, তখন তার মজাই আলাদা। অবশ্য বড়রা অন্য কথা বলেন। আরে বাবা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে না খেলে মজাটা কোথায়! আইস্‌ক্রীম ছাড়াও নানারকম শরবতও খুবই প্রিয় তোমাদের অনেকের। আর শরবত তৈরী একদম সোজা। তোমরা নিজেরাই নিশ্চয় তৈরী করতে পারো। না পারলে শিখে নাও চটপট আর বাড়িতে কেউ এলে তাঁকে বানিয়ে খুশী করে দাও। শরবত ছাড়াও নানারকম কোল্ড-ড্রিঙ্কস্‌-এর এখন রমরমা। এতে হাঙ্গামাও কম।

বোতলে তৈরী করাই থাকে। কিনে নাও আর খাও। এই কোল্ড-ড্রিঙ্কস্‌ নানারকম স্বাদে পাওয়া যায়—coke, orange, lemon, pineapple। তার থেকে যেটা পছন্দ হবে, সেটাই খাও। তবে রাস্তায় কাঠের গাড়িতে করে যেসব রঙিন জল নিয়ে যায়, সেগুলো কিন্তু ভুলেও খেও না, খেলেই সর্বনাশ! কারণ বরফ মেশানো ঐসব রঙিন জল খেতে সুস্বাদু হলেও তার থেকে নানারকম অসুখ হতে পারে। আর জানোই তো, খোলা বা আঢাকা খাবার খাওয়া কখনোই উচিত না। কারণ তাতে সে'সব খাবারে ধুলো বালি

হাজার ব্যস্ততা, নানান ঝামেলা তবু মাথা ঠাণ্ডা,
পরিপাটি সারাদিন

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সারাদিন অনেক ঝামেলা, নানান ব্যস্ততা। এরই মধ্যে আপনাকে নানা রকমের সিদ্ধান্তও নিতে হয়। তাই আপনার দরকার হাজার ব্যস্ততা আর উত্তেজনার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখা. সঙ্গে পরিপাটি – ছিমছাম থাকা – সারাদিন।

জবাকুসুম ব্যবহার করুন। এই তেল আপনার মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, চুলের প্রয়োজনীয় যত্নও নেবে। সারাদিন মিষ্টি গন্ধের আমেজ আপনাকে ঘিরে থাকবে। রাত্রে ঘুমও হবে চমৎকার।

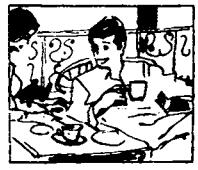

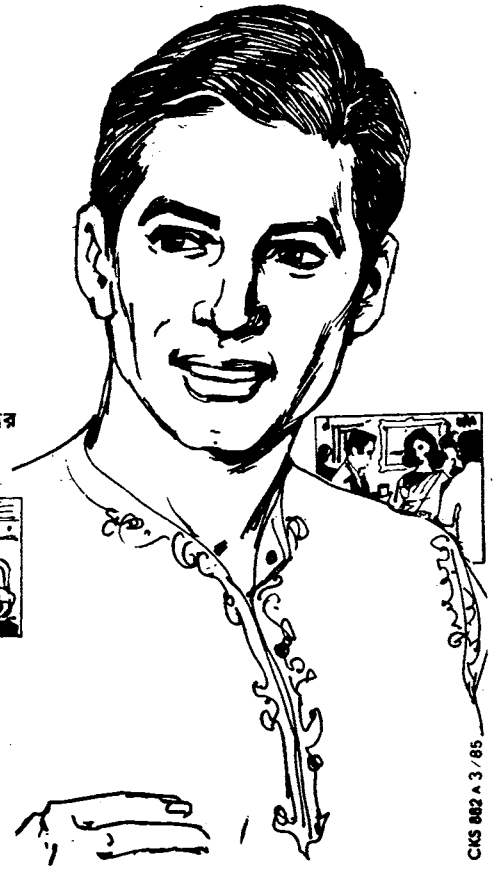

জবাকুসুম কেশ তৈল
—যার সুনাম চিরদিনের
সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২, নিউ দিল্লী-১৫

CKS 882 A 3/85

রাজুর গেঞ্জি পরে খোকন
খেলতে নেমেছে
উৎসাহে তাই বন্ধুরা সব
কোমর বেঁধেছে

RAJU

গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা
কিনেও আরাম, পরেও আরাম

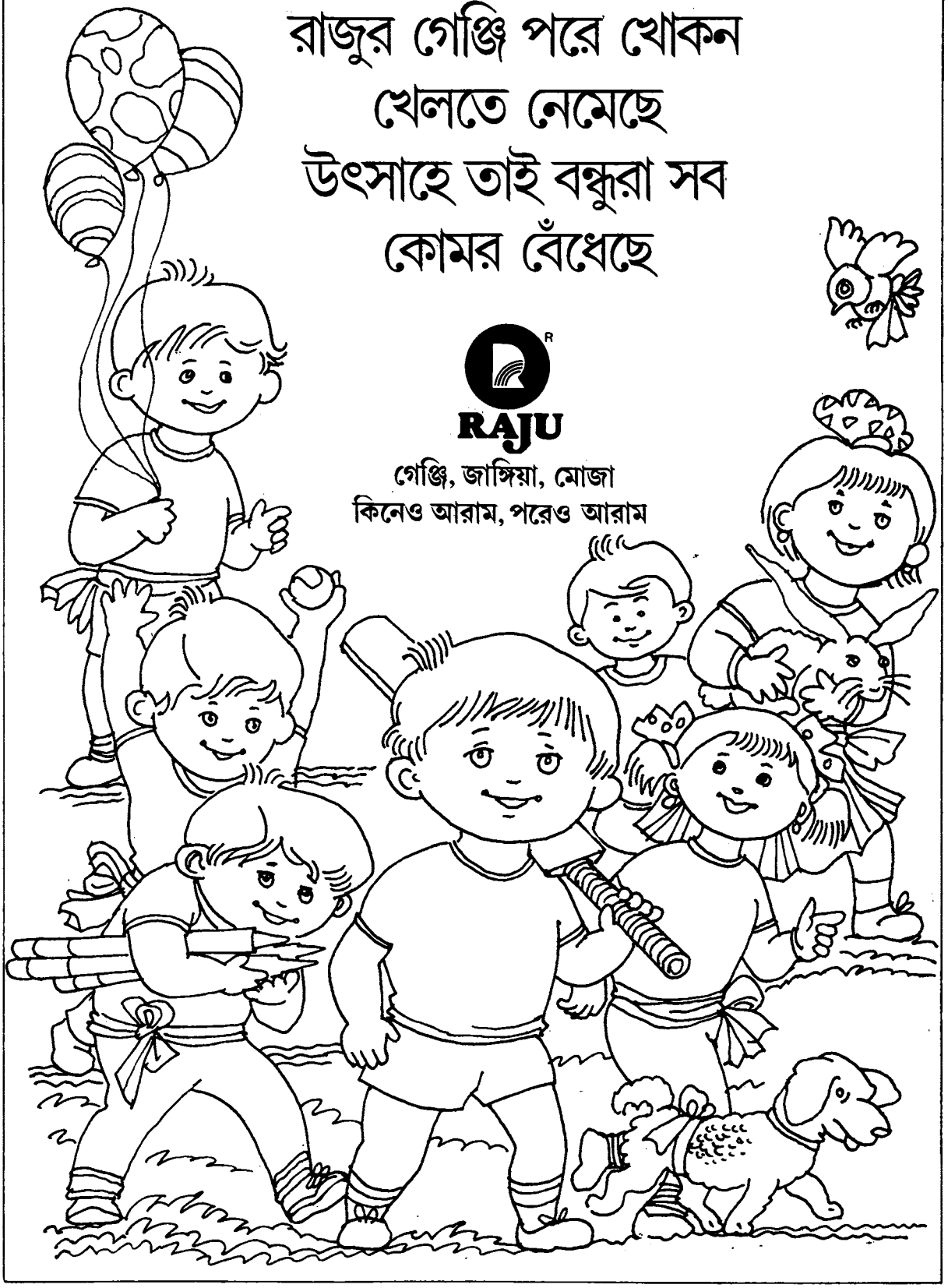

পড়ে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার।

এ তো গেল তৈরী খাবারের কথা। কিন্তু গরমে তো আরও খাবার খাওয়া হয়। আম ছাড়া গরমকাল ভাবা যায় কি ? তাও আবার কতরকম—ল্যাংড়া, ফজলি, হিমসাগর, গোলাপখাস আরও কত। এ ছাড়া জাম তো আছেই।

আচ্ছা এতক্ষণ তো শুধু খাওয়ার কথাই হল। সাধে কি বলে, 'বাঙালীরা খেয়েই মরল'। তা বাপু আমাদের 'লাগে না মনে, তোমরা যা বল তাই বল' ! খাওয়ার পরেই যে কথাটা আমাদের মনে পড়ে, তা হল কাপড় পরা। গরমকালে অবশ্য কাপড়চোপড় বেশী পরার কোনো মানেই হয় না। সুতির জামা আমাদের দেশের গরমের পক্ষে সবচেয়ে আরামের। আর গেঞ্জি পরাও দরকার কারণ প্যাচপেচে ঘাম শুষে নেয় গেঞ্জি। গেঞ্জি গায়ে পাখার নীচে গা এলিয়ে শুয়ে থাকা, অলস

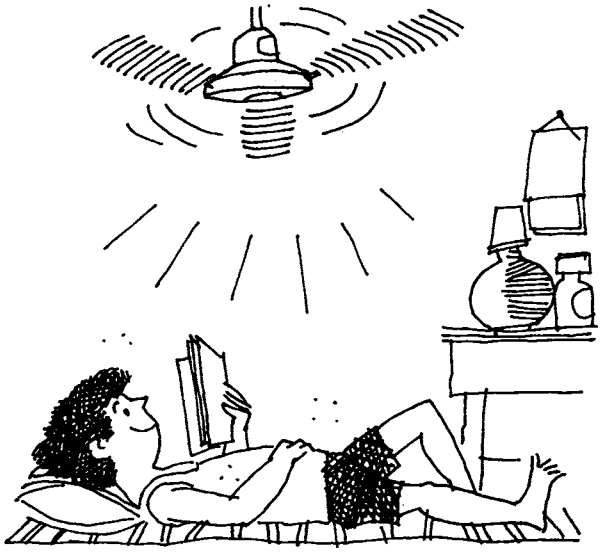

সময় কাটাবার একটা দারুণ উপায় !

এবার গরমের ছুটিতে নিশ্চয় কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ।

কোথায় যাবে ঠিক করেছ—শৈলশহর দার্জিলিং নাকি সৈকতাবাস পুরী ?

কাশ্মীরও কিন্তু এই গরমে বেশ মনোরম। কিন্তু লোকের মুখে যা শুনেছ, ঠিক ভূস্বর্গটি আর নেই এখন। তবে যেখানেই যাও, চিরমধুর বাংলা ভাষা শুনতে পাবে সর্বত্র। তোমরা জানো বোধহয় উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম যেখানেই যাবে, সেখানেই বাঙালি ভ্রমণকারীদের ছড়াছড়ি। তাই কোনো জায়গায় মনে হবে না যে তোমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এসেছ ! যারা বাড়িতেই গরমের ছুটিটা কাটাবে বলে ঠিক করেছ, তারাও আরামে থাকবে আশা করা যায়। এ সময়টা অন্ততঃ স্কুলের পড়ার চাপ আর গুরুজনদের বকাঝকা খবদারি থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু এ সময় সবচেয়ে বড় শত্রু (নাকি বেশিরভাগ সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে মিত্র !) বোধহয় লোডশেডিং। কখন যে কার ওপর দয়া এই ভগবানের, সে কেবল তিনিই জানেন। উনিই একমাত্র দেবতা যিনি অকাতরে আশীর্বাদ করেন। অন্য কোনো দেবতার এ গুণটি আছে বলে জানা যায়নি এখনও পর্যন্ত। এভাবেই দেখতে দেখতে গরমের রেশ কেটে গিয়ে চলে আসবে বর্ষার নির্মল বারিধারা। আর বর্ষার তালে তাল মিলিয়ে তোমরাও সমস্বরে বলে উঠবে—Beat the heat with raindrops !!

বাজারে কোন হাওয়াই চপ্পল দেখতে সুন্দর কোনটা শক্তিশালী কোনটা বা আরামদায়ক

একমাত্র অজন্তাতেই পাবেন ওপরের তিনটি গুণই

মুগুর ছাপ®

অজন্তা হাওয়াই®

সর্বাধুনিক মেসিনে উন্নত কারিগরি নিপুনতায় প্রস্তুত বলে শুধু নামেই নয় সবসময় গুণেও সেরা।

SAA/FARINNI/4 BEN

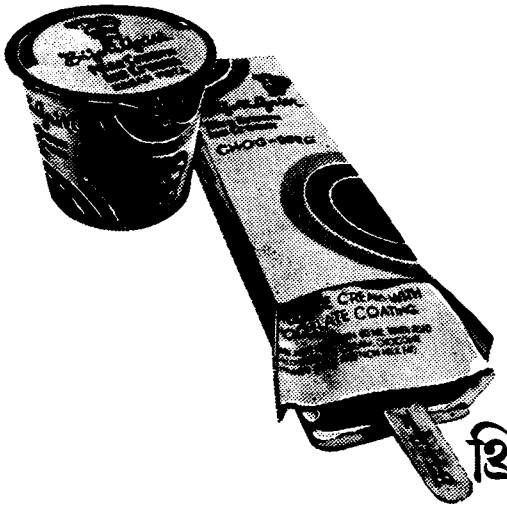

খাঁটি দুধ আর সেরা ক্রীম
নাইসক্রীম নাইসক্রীম ।।
ছেলে বুড়ো সবার ড্রিম
নাইসক্রীম নাইসক্রীম ।।
সবার সেরা আইসক্রীম
নাইসক্রীম নাইসক্রীম ।।

থ্রি চীয়ার্স ফর নাইসক্রীম হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে

Bijoligrill

ফুড প্রোডাক্টস
৩৫বি, এস· পি মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন : ৪৭-০৯১২

ANANDAMELA 12 JUNE, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-S

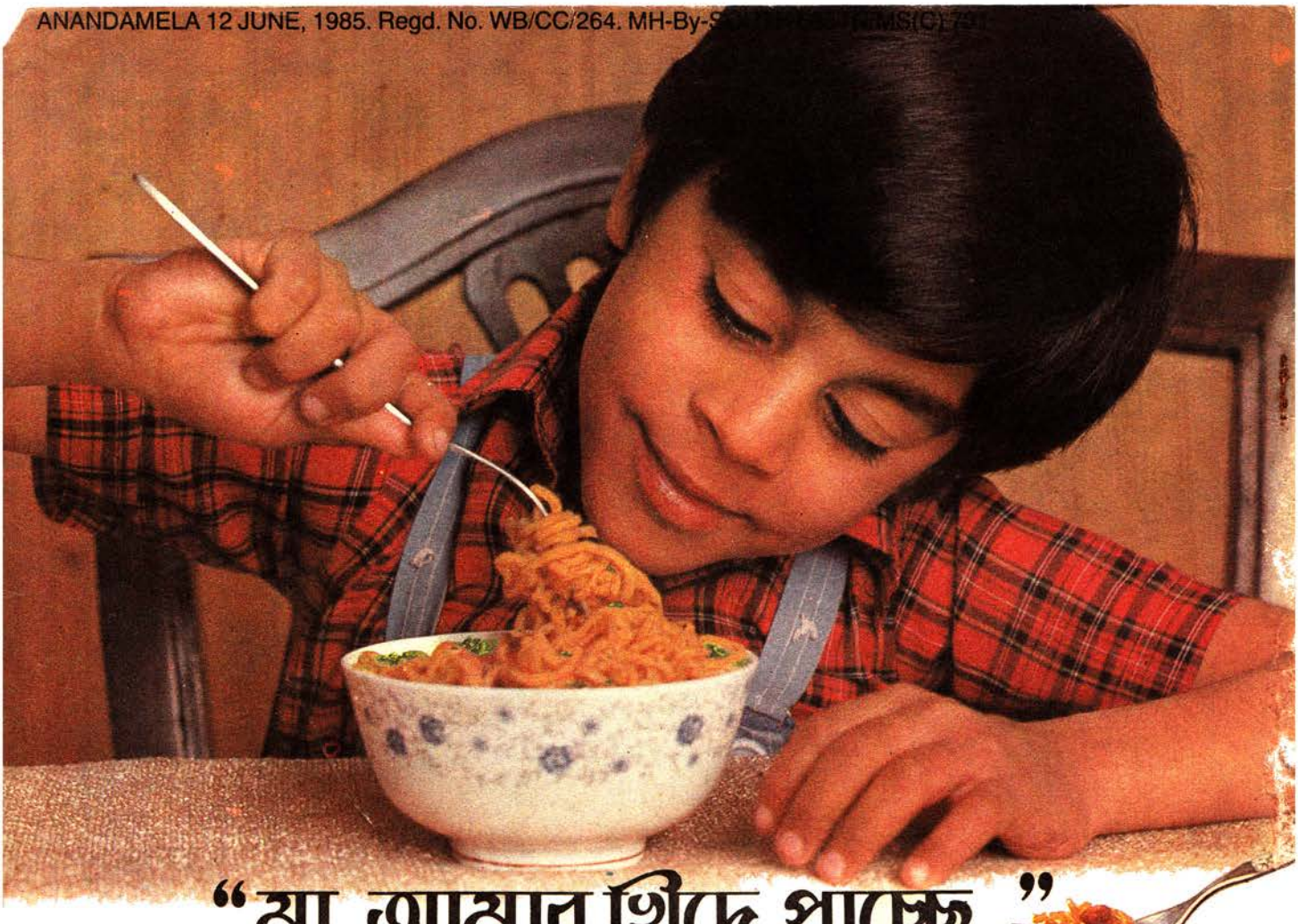

"মা, আমার খিদে পাচ্ছে.."

বাচ্চাদের সব সময়ই খিদে পায়—আর আশ্চর্য, তার কোনো সময় অসময় নেই। এবং কোনো মা-ই কি এই ছোট্ট সহজ কথাগুলোকে ফেলতে পারে ? কিন্তু আপনিও তৈরী। কারণ সুস্বাদু পুষ্টিকর চমৎকার খাবার তৈরী করার জন্য আপনার হাতে আছে ম্যাগি। পাঁচটি চমৎকার ফ্লেবার– চিকেন, মসালা, ক্যাপসিকা, লাসানিয়া এবং সুইট সাওয়ার দিয়ে খাবার তৈরী করে দিন।

অবশ্য বাচ্চারা তো রকমারী খাবারেরই ভক্ত। আর ওদের জন্য নতুন নতুন খাসা রান্না করতে আপনারও ভাল লাগবে।

বিনামূল্যে!
ম্যাগি ব্যাঞ্জন পুস্তিকা
আপনার জন্য একটি পুস্তিকা পাঠাতে লিখুন এই ঠিকানায় :
পোস্ট বক্স নং ৩৮৫৫
নিউ দিল্লী

MAGGI® 2-Minute noodles

ক্রাঞ্চি মসালা

উপকরণ
১ প্যাকেট মসালা টেস্টমেকার সহ ম্যাগি ২ মিনিট নুডলস
বড় (টেবিল) চামচের ১ চামচ তেল
৫০ গ্রাম (½কাপ) কাঁচা চিনেবাদাম
১½ কাপ (২০০ মিলিলিটার) জল
১টা কাঁচা লঙ্কা, কুচিয়ে
১ গোছা ধনে পাতা, কুচিয়ে

পদ্ধতি
চিনেবাদাম তেলে বেশ বাদামী করে ভেজে রেখে দিন।
জল ফুটতে দিন। জল ফুটে গেলে টেস্টমেকার এবং ম্যাগি-মিনিট নুডলস্ কাঁচা লঙ্কা মেশান।
২ মিনিট ফুটতে দিন।
ভেজে রাখা চিনেবাদাম মিশিয়ে নিন এবং পরিবেশন করার আগে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

NEW

রান্না হয় চটাচটি! খেতে লাগে মজাদারী!

FSL-8554 BEN